Ballpoint by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

www.Murchona.com
মূর্ছনা

নিতাদ বেবী'কে
(নিষাদ হুমায়ূন)

বাবাকে সে খুব বেশিদিন কাছে পাবে বলে মনে হচ্ছে না। যদি কোনো বিষণ্ন চৈত্রের দিনে বাবার কথা তার জানতে ইচ্ছা করে, তখন এই বই সে পড়বে। এবং সে নিশ্চয়ই বলবে, আমার বাবা ছিলেন একজন 'দুঃখী বলপয়েন্ট'!

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

ভূমিকা

লেখালেখি এক নিঃসঙ্গ যাত্রা। বলপয়েন্টে সেই নিঃসঙ্গ যাত্রার কথা বলার চেষ্টা করেছি। যে রহস্যময় ভুবনে লেখা তৈরি হয়, তা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা ছিল। করতে পারি নি। বড়ই কঠিন কর্ম। কিছু ভুলভ্রান্তি মনে হয় থেকে গেল। থাকুক। ভ্রান্তিবিলাসের আনন্দ তুচ্ছ করার মতো না।

স্ত্রী শাওন নানানভাবে বলপয়েন্ট লেখায় সাহায্য করেছে। এই কাজটি সে ধন্যবাদ পাবার আশায় করে নি বলেই লিখিতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না। পুত্র নিষাদ লেখার সময় বলপয়েন্ট কেড়ে নিয়ে আনন্দময় বিঘ্ন তৈরি করেছে। তাকে ধন্যবাদ।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক কথাশিল্পী মঈনুল আহসান সাবেরের উৎসাহ এবং চাপাচাপিতেই বলপয়েন্টের জন্ম। বলপয়েন্ট পড়ে যাঁরা আহত হবেন, তাঁরা সাবেরকে ধরতে পারেন।

হুমায়ূন আহমেদ

বলপয়েন্ট / হুমায়ূন আহমেদ

আমার পুত্র নুহাশকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, তুমি বড় হয়ে কি বাবার মতো লেখক হতে চাও ? নুহাশ বলল, না।

কেন না ?

নুহাশ গম্ভীর গলায় বলল, লেখক হলে খুব বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হয়। সে সবসময় আমাকে দেখেছে— লিখতে শুরু করেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখা বন্ধ করে বারান্দায় হাঁটছি। আবার লিখছি আবার হাঁটছি। সে ধরেই নিয়েছে হাঁটাহাঁটি লেখালেখিরই একটা অংশ। বাংলা একাডেমীর লেখক প্রকল্পের একজন আমাকে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার লেখালেখির প্রধান অনুপ্রেরণা কী ? আমি গম্ভীর গলায় বললাম, হন্টন।

একবার সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এত ভালো সাঁতার কোথায় শিখেছেন ? চ্যাম্পিয়ন বললেন, টিউবওয়েলে শিখেছি।

টিউবওয়েলে সাঁতার শিখলেন কীভাবে ?

আমাকে কল চেপে বালতির পর বালতি পানি তুলতে হতো। সেটা করতে গিয়ে হাতের মাসল শক্ত হলো। সেখান থেকে সাঁতার।

আমার বেলাতেও কি তাই ? হাঁটতে হাঁটতে পা শক্ত। যে কারণে দীর্ঘ সময় মাটিতে বসে থাকতে পারি। সমস্যা হয় না।

চেয়ার-টেবিলের যুগে আমি লিখি মেঝেতে বসে। তারাশঙ্করের আত্মজীবনীতে পড়েছি, তিনি মেঝেতে বসে টুলবক্সের মতো ছোট্ট জলচৌকিতে লিখতেন। জলচৌকির ডালা খোলা যেত। ডালার ভেতর থাকত কাগজ এবং কলম। আমার অনুপ্রেরণা তারাশঙ্কর না। চেয়ার-টেবিলে বসে লেখার সময় নিজেকে কেমন যেন অফিসের কর্মচারী মনে হয়। মেঝেতে ছোট্ট একটা জলচৌকি অনেক আপন, অনেক ঢিলেঢালা।

তবে কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টার সময় আমি অফিসার অফিসার ভঙ্গিতে সোফায় বসে লিখেছি। সেবছরই আমাদের নতুন সোফা কেনা হয়েছে। তখনো আমার নিজের লেখার জলচৌকি হয় নি। লেখালেখির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেঝেতে বসে করার চিন্তাও মাথায় নেই।

www.murchona.com
sumaun_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

দেড় থেকে দু'ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করে আমি বারো লাইনের একটা কবিতা (না-কি পদ্য) প্রসব করে ফেললাম। ঘটনার সমাপ্তি এখানে হলেই ভালো হতো, তা হলো না। খাম ডাকটিকিট কিনে আনলাম। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর মহিলা পাতার সম্পাদিকাকে একটা চিঠি লিখলাম—

প্রিয় আপা,

সালাম জানবেন। আমার নাম মমতাজ আহমেদ শিখু।

আমি একটি কবিতা পাঠালাম...

মমতাজ আহমেদ আমার ছোটবোনের নাম। সে তখন ক্লাস টেনে পড়ে। আমার ধারণা হয়েছিল, ক্লাস টেনে পড়া একটি কিশোরীর কবিতা হিসাবে আমার কবিতাটা চলতে পারে।

কী সর্বনাশ! পরের সপ্তাহেই কবিতাটা ছাপা হয়ে গেল। আমার যারা পাঠক, তারা কিন্তু জীবনের প্রথম লেখা কবিতাটার দু'টা লাইনের সঙ্গে পরিচিত, কারণ এই দু'টা লাইন আমি আমার দ্বিতীয় উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার*-এ ব্যবহার করেছি।

দিতে পারো একশ ফানুস এনে
আজন্ম সলজ্জ সাধ একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।

প্রথম কবিতা ছাপা হয়ে যাওয়া কবির জন্যে বিরাট ব্যাপার। আমি সোফায় বসে কাব্যচর্চা করতেই থাকলাম এবং *দৈনিক পাকিস্তান*-এ বেশ কিছু মমতাজ আহমেদ শিখুর কবিতা ছাপা হয়ে গেল। আল্লাহপাকের অসীম করুণা, কবিতা নামক সেইসব আবর্জনার এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

লেখায় সামান্য ভুল করলাম। মমতাজ আহমেদ শিখু নামে প্রকাশিত কবিতা আমার প্রথম কবিতা না। স্বনামে স্কুল-ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছে। ঈশ্বর-বিষয়ক অতি উচ্চশ্রেণীর ভাব-বিষয়ক ইংরেজি কবিতা। কবিতার নাম 'God'। কবিতাটা ছাপা হয়েছে কবির ছবিসহ। ছবির নিচে লেখা Humayun Ahmed Class X Section B. কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন মনে আছে—

Let the earth move
Let the sun shine
Let them to prove
All are in a line

Move এর সঙ্গে prove এর অন্তর্মিল। Shine এর সঙ্গে line.

মাইকেল মধুসূদন হবার চেষ্টা থেকে যে ইংরেজি কবিতা রচিত হলো, তা কিন্তু না। স্কুল-ম্যাগাজিনের দায়িত্বে যে স্যার ছিলেন, তাঁকে আমি বাংলায় গল্প,

www.MurchOna.com

কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী সবই লিখে জমা দিয়েছি। প্রতিটি রচনা পড়েই তিনি বলেছেন, মোটামুটি অখাদ্য। যাই হোক, তোর যখন এত আগ্রহ, তুই বরং ইংরেজিতে যা ইচ্ছা লিখে নিয়ে আয়, ছেপে দেব। ইংরেজি সেকশানে কোনো লেখা জমা পড়ে নি।

স্কুল-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমাদের ক্লাসের ইংরেজির শিক্ষক (স্যারের নাম মনে করতে পারছি না) এক কপি স্কুল-ম্যাগাজিন হাতে ক্লাসে ঢুকলেন, এবং আমাকে মহালজ্জায় ফেলে আমার লেখা কবিতা পড়ে শোনালেন। তিনি তাঁর ছাত্রের ইংরেজি কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ। কবিতা পাঠ শেষ হবার পর তিনি বললেন, হুমায়ূন, তুই ইংরেজি কবিতা লেখার চর্চা ছাড়বি না। আমি দোয়া দিলাম। খাস দিলে দোয়া দিলাম।

আমাদের ইংরেজি স্যার নিশ্চয়ই এখন জান্নাতবাসী। ইংরেজি কাব্য রচনায় স্যারের দোয়া কাজে লাগে নি। কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থও হয় নি। ইংরেজি কবিতা না লিখলেও কিছু গদ্য তো লিখেছি! যদিও একজন গদ্যকার কবির পদধূলিরও নিচে থাকেন। সমারসেট মমের একটি উদ্ধৃতি দেই।

> The crown of literature is poetry. It is its end and aim. It is the sublimest activity of the human mind. It is the achivement of beauty and delicacy. The writer of prose step aside when the poet passes.

শেষ লাইনটা ভয়াবহ— 'একজন কবি যখন যাবেন তখন একজন গদ্যকার পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়াবেন।'

এত সম্মান কবিদের!

আমার কবিতা (?) রচনা চলতেই থাকল। আমার একজন সহপাঠী বন্ধু (এখনকার বিখ্যাত কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা) চটি একটা কবিতার সংকলন নিজ খরচায় বের করলেন। সেখানেও তিনি আমার একটা কবিতা (নিতান্তই দয়াবশত) ছাপলেন। কয়েকটা লাইন এখনো মনে আছে—

> রঙিন সুতার ছিপ ফেলে এক প্রজাপতি ধরতে গিয়ে
> উল্টে পড়ে এই উঠোনেই।
> মাগো, তোমার খুন হয়েছে বিশ বছরের যুবক ছেলে...

আমার কাব্যরোগ পুরোপুরি কীভাবে সারল সেই গল্প বলি। আমার কাব্যরোগের প্রধান এবং একমাত্র চিকিৎসকের নাম হুমায়ূন কবির (কুসুমিত ইস্পাতের কবি, দেশ স্বাধীন হবার পর আততায়ীর হাতে নিহত)। আমি তাঁর কাছে তিনটা টাটকা কবিতা নিয়ে গেছি। টাটকা, কারণ গত রাতেই লেখা।

www.MurchOna.com

চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি। বাসি হবার সময় পায় নি। কবিতা বাসি হতে বাহাত্তর ঘণ্টা লাগে।

অধ্যাপক হুমায়ূন কবির বললেন, কী চাই?

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, তিনটা কবিতা নিয়ে এসেছি।

তাঁর কাছে কবিতা নিয়ে যাবার কারণ তখন বাংলা একাডেমী ঠিক করেছে গল্প, প্রবন্ধ এবং কবিতার তিনটি আলাদা সংকলন বের করবে। সংকলনগুলিতে প্রধান লেখকদের লেখা যেমন থাকবে, অপ্রধানদেরও থাকবে। অধ্যাপক হুমায়ূন কবির কবিতা সংকলনটির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কৃপায় যদি বাংলা একাডেমী সংকলনে স্থান পাওয়া যায়। হুমায়ূন কবির বললেন, আপনার কবিতা কি কোথাও ছাপা হয়েছে?

আমি বললাম, জি-না।

ছন্দ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে?

জি-না।

অন্যের কবিতা পড়েন?

জি-না।

তিনবার জি-না শোনার পর তিনি ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে মনে খুব কষ্ট পেলেও তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সত্যি। অবশ্যই কবিতা কোনো সস্তা বাজারি বিষয় নয়। কবিতা লিখতে যে মেধা এবং মনন লাগে, তার জন্ম এই ভুবনে না। কবিতার ছন্দ শিখতেই লাগে দশ বছর।

আমি ভগ্নহৃদয়ে তিনটা টাটকা কবিতা নিয়ে মহসিন হলে ফিরলাম। তিনটা কবিতাই বহুখণ্ডে ছেঁড়া হলো। রোগমুক্তির আনন্দ নিয়ে আমি Chemistry-র বই খুলে বসলাম। পড়াশোনা ঠিকমতো করতে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে। একসময় সংসারের হাল ধরতে হবে। আমার মতো দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলের মহান কাব্যরোগ মানায় না। আমি কবিতা লেখা পুরোপুরি ছেড়ে দিলাম।

'বলপয়েন্ট'-এর প্রথম কিস্তি এই পর্যন্ত লিখেছি। এইটুকুই ছাপা হবার কথা। পড়তে দিয়েছি শাওনকে। সে বলল, তুমি তো ভুল কথা লিখেছ। তুমি গদ্যলেখক সেটা ঠিক, কিন্তু সারাজীবনই তো প্রচুর কবিতা লিখেছ, গান লিখেছ।

আমি বললাম, এইসব ফালতু ফরমায়েশি জিনিস।

শাওন বলল, আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় প্রায়ই আমাকে চার লাইন, ছয় লাইনের কবিতা লিখে পাঠাতে। সেগুলি তো ফালতু না।

www.MurchOna.com

আমি বললাম, সেগুলি তোমাকে উদ্দেশ করে লেখা বলেই তোমার কাছে ফালতু কখনোই মনে হবে না। আসলে ফালতু।

শাওন স্যুটকেস খুলে একটা চিরকুট বের করে বলল, এখানের আটটা লাইন কি ফালতু?

আমি লাইনগুলি হুবহু তুলে দিলাম। পাঠক বিচার করবেন।

আমাকে নিয়ে নানা গল্প আছে
সেই গল্পে আছে একটা ফাঁকি
বিরাট একটা বৃত্ত এঁকে নিয়ে
ভেতরে নাকি আমি বসে থাকি।
কেউ জানে না শাওন, তোমাকে বলি
বৃত্ত আমার মজার একটা খেলা
বৃত্ত-কেন্দ্রে কেউ নেই, কেউ নেই
আমি বাস করি বৃত্তের বাইরেই।

www.MurchOna.com

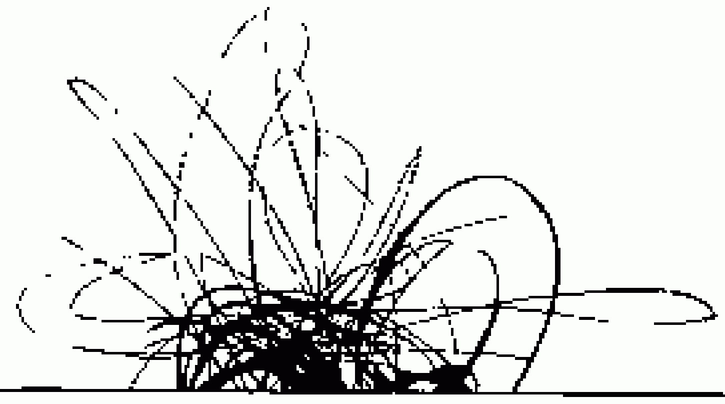

> You can divorce your spouse, you can fire your secretary, abandon your children. But they remain your coauthors forever.
>
> —Ellen Goodman

স্যার, আপনি প্রথম লেখালেখি শুরু করেন কখন ?

যখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি তখন অ আ লেখা শুরু করি।

এই লেখার কথা বলছি না স্যার। ক্রিয়েটিভ রাইটিং।

ক্রিয়েটিভ রাইটিংও ক্লাস ওয়ানেই শুরু করি। আমি 'ক' লিখতাম উল্টো করে। দেখতে অনেকটা 'ধ'য়ের মতো। একে নিশ্চয়ই তুমি ক্রিয়েটিভ রাইটিং বলবে!

স্যার, প্রথম যে গল্প লিখেছেন সেটার কথা বলুন।

আমার প্রথম লেখা গল্পটা অন্যের লেখা।

বুঝতে পারছি না। একটু যদি বুঝিয়ে বলেন।

নিজের নামে চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলের ম্যাগাজিনে যে গল্প ছাপা হয়েছিল, সেটা আমার বাবার লেখা।

ওনার লেখা গল্প চুরি করে আপনি স্কুল ম্যাগাজিনে দিয়েছেন!

তোমার প্রশ্নের জবাব আর দিতে ইচ্ছা করছে না। এখন বিদায়!

তাহলে আমি কী লিখব ?

তোমার যা ইচ্ছা লেখো।

কথোপকথন হচ্ছে আমার সঙ্গে মাহফুজ আহমেদের। সে তখনো বিখ্যাত নায়ক হয় নি। *পূর্ণিমা* নামের একটা পত্রিকায় কাজ করত। হঠাৎ তার ইচ্ছা হলো 'এক হাজার একটি প্রশ্নে হুমায়ূন আহমেদ' নামে বই লিখবে। আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় রোজ অসময়ে এসে বসে থাকে। প্রশ্নে প্রশ্নে মহাবিরক্ত করে। শেষের দিকে তাকে আমি বললাম, একটা কাজ কর, নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তরগুলো দিয়ে দাও। আমি কিছুই বলব না। মাহফুজ আহমেদ নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটা করে বই বের করে ফেলল। বইয়ের কয়েকটা এডিশনও হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

মাহফুজকে আমার প্রথম লেখা গল্পের ইতিহাস বলা হয় নি।

এখন বলি। পড়ি ক্লাস সেভেনে, স্কুল-ম্যাগাজিনে গল্প দিতে হবে। একটা ভূতের গল্প লিখেছি। বাবা বললেন, দেখি কী লিখেছিস।

আমি বাবার হাতে গল্প দিলাম। তিনি বললেন, অনেক কারেকশন লাগবে। কলম দে।

কলম দিলাম। বাবা গল্প কাটাকাটি করে ছেঁড়াবেড়া করে দিয়ে বললেন, কপি করে আন।

আমি কপি করে তাঁর কাছে দিলাম। তিনি আবারো শুরু করলেন কাটাকুটি। তৃতীয় দফায় কাটাকুটির পর যা অবশিষ্ট রইল, সেটা আর যাই হোক আমার গল্প না। আমার গল্পে একজন বুড়ো মানুষের হুঁকা টানার কথা ছিল। সেখানে কলকের বিষয়ে কোনো কথা নেই। বাবা কলকের দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। তার দিয়ে মোড়া, কোণ সামান্য ভাঙা ইত্যাদি। আমি সেই গল্পই জমা দিলাম। গল্প ছাপা হলো। বাবা পুত্র-প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। অফিসে স্কুল-ম্যাগাজিন নিয়ে যান। কলিগদেরকে ছেলের গল্প পড়ে শুনিয়ে নিজেই বলেন— অসাধারণ!

আমার মা'র গল্প লেখার শখ ছিল। তাঁর কয়েকটি গল্প *আল ইসলাহ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সমস্যা একটাই, সব গল্পই বাবা এমনভাবে কাটাকুটি করেছেন যে, গল্পগুলি মূলত তাঁরই হয়েছে। মা'র গল্প হয় নি।

কিছুদিন আগে আমার মা'র আত্মজীবনীমূলক একটি রচনা *জীবন যেখানে যেমন* সময় প্রকাশন প্রকাশ করেছে। বইটির সাতটি মুদ্রণও হয়েছে। বাবা বেঁচে থাকলে কাটাকুটির পর এই বইয়ের কী গতি হতো কে জানে।

সাহিত্য কী হবে, কেমন হবে, এই বিষয়ে বাবার নিজস্ব ধারণা ছিল। তাঁর কাছে সাহিত্য কঠিন সাধনা এবং কঠিন পরিশ্রমের বিষয়। সঙ্গীতশিল্পীকে যেমন রোজ রেয়াজ করতে হয়, যে সাহিত্য করবে তাকেও রোজ রেয়াজ করতে হবে। এই রেয়াজ হচ্ছে, কবিতা মুখস্থ করতে হবে। বাবা *গীতাঞ্জলি* থেকে বেছে তাঁর পুত্রকন্যাদের কবিতা ঠিক করে দিতেন। এইসব কবিতা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাতে হবে। জাফর ইকবালের ভাগে পড়ল 'প্রশ্ন' কবিতা। আমার ছোটবোনের ভাগে পড়ল— 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী'। আমি যেহেতু বড় ছেলে, আমার ভাগে পড়ল— 'এবার ফেরাও মোরে', ১২৮ লাইনের একটা কবিতা। কবিতাটা বিএ ক্লাসে তাঁর পাঠ্য ছিল। খুবই প্রিয় কবিতা।

আমার দুই ভাইবোনই মেধাবী। তারা দ্রুত কবিতা মুখস্থ করে বাবাকে শুনিয়ে এক আনা করে পুরস্কার পেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, অতি কঠিন এই কবিতা কিছুতেই মুখস্থ হয় না। আমার বয়স তখন কত? নয় বছর, ক্লাস ফোরে পড়ি।

www.MurchOna.com

রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে বিভীষিকার মতো উপস্থিত হলেন। এই বিশেষ কবিতাটি তিনি কেন লিখেছেন ? এর অর্থ কী ?— কিছুই জানি না। কবিতা মুখস্থ করার চেষ্টা করি। কোনো লাভ হয় না। সব জট পাকিয়ে যায়।

বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুলে অনুষ্ঠান হয়। সেইসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আমাদের ভাইবোনদের জন্যে পিতৃআদেশে বাধ্যতামূলক। আমাকে কবিতা আবৃত্তিতে নাম দিতে হলো। কবিতার নাম 'এবার ফেরাও মোরে'। কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী সর্বনাশ!

কবিতা আবৃত্তির সময় উপস্থিত হলো। আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। দর্শকের সারিতে হাসিমুখে আমার বাবা উপস্থিত। পুত্র-প্রতিভায় মুগ্ধ হবার জন্য তৈরি।

আমি কবিতার নাম এবং কবির নাম বলে মুখ ভোঁতা করে দাঁড়িয়ে আছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। একটি লাইনও মনে পড়ছে না। কেঁদে ফেলা ঠিক হবে কি-না তাও বুঝতে পারছি না। হঠাৎ স্পষ্ট শুনলাম আমার কানের কাছে কে যেন শান্ত গলায় বলল, 'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত'।

আরে এটাই তো কবিতার প্রথম লাইন। আমি গড়গড় করে বলে যাচ্ছি। যেখানেই আটকানোর আশঙ্কা সেখানেই কেউ একজন বলে দিচ্ছে।

বালক বয়সে ব্যাপারটা অতি বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। এখন জানি এটা মস্তিষ্কের একটা খেলা। পুরো কবিতাটাই অবচেতন মনে জমা করা আছে। অবচেতন মস্তিষ্ক চেতন মস্তিষ্ককে সময়মতো তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। প্রকৃতি রহস্যময় আচরণ করলেও প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

বালকের মুখে অতি দীর্ঘ এই কবিতায় আমাদের হেড স্যার মুগ্ধ হয়ে একটা বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করলেন। আমার হাতে ঢাউস এক বই ধরিয়ে দিলেন। খুলে দেখি এ টি দেবের *ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি*। আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হলো। ডিকশনারি দিয়ে আমি কী করব ? অন্যরা কত সুন্দর সুন্দর পুরস্কার পেয়েছে— গল্পের বই, থালাবাটি, চায়ের কাপ। আর আমার হাতে কিনা ডিকশনারি ?

রবীন্দ্রনাথ আরো একবার আমার ঘাড়ে ভর করলেন। আমি তখন চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি। স্কুলে বড় করে অনুষ্ঠান হবে। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। সাজ সাজ রব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন হরলাল রায় স্যার। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুই রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করবি। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'। কবিতা মুখস্থ করে আয়, কীভাবে আবৃত্তি করতে হবে আমি শিখিয়ে দেব।

কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। স্যার আবৃত্তি শিখিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী যেখানে বসে থাকবেন সেদিকে আঙুল তুলে বলবি— 'কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি ?' দুই হাত অঞ্জলির মতো করে বলবি— 'পারিব কি পাঠাইতে তোমাদের করে ?' যে জায়গায় আছে— 'আজিকার কোনো ফুল' সেখানে আঙুল এরকম করে একটা মুদ্রা করবি। এই মুদ্রার নাম পদ্মমুদ্রা (শাওন বলল, পদ্মমুদ্রা বলে কোনো মুদ্রা নেই। আলাপদ্ম মুদ্রা আছে। আমার ধারণা আলাপদ্মই বাংলায় পদ্ম)।

আমার কাছে আবৃত্তির পুরো বিষয়টাই অস্বাভাবিক লাগল। হরলাল রায় স্যারকে এটা বলার সাহস হলো না।

সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষামন্ত্রী এলেন না। আমাদের আয়োজন জৌলুসহীন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের রাতে স্টেজে উঠে দেখি বাবা এসেছেন। পুত্রের প্রতিভা দেখার জন্যে গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন। শিক্ষামন্ত্রী যেহেতু নেই আমি বাবার দিকে আঙুল তুলে বললাম, 'কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি ?' বাবা নড়েচড়ে বসলেন।

বাবা বাসায় ফিরে মা'কে বললেন, তোমার বড় ছেলে এমন সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছে, ওকে পুরস্কার হিসাবে দশটা টাকা দিয়ে দাও। সংসার খরচের সব টাকা থাকে মা'র কাছে। টাকা দিতে হলে তাঁকেই দিতে হবে। দশ টাকা তখন অনেক টাকা। আমি দীর্ঘদিন ঘ্যানঘ্যান করার পর মা'র কাছ থেকে দু'টাকা আদায় করতে পারলাম। সেই টাকায় সঙ্গে সঙ্গে চারটা স্বপন কুমার সিরিজের বই কিনে আনলাম। প্রতিটি বইয়ের দাম আট আনা। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

এক যুগ আগে কী একটা কাজে চিটাগাং গিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম হরলাল রায় স্যার জীবিত। রিটায়ার করেছেন। শরীর দুর্বল। দিনরাত শুয়েই থাকেন।

ঠিকানা জোগাড় করে তাঁকে দেখতে গেলাম। পা স্পর্শ করে বললাম, স্যার আমি হুমায়ূন। স্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই হুমায়ূন না রে ব্যাটা। তুই হুমায়ূন আহমেদ। বলেই হৈচৈ শুরু করলেন, কে এসেছে দেখ। কে এসেছে দেখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। মনে হলো আমার মানবজন্ম সার্থক। (আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি। যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি।)

পৃথিবীতে কিছু ব্যাধি আছে যার ওষুধ নেই। যেমন ক্যানসার, পাঠব্যাধি। পাঠব্যাধিতে আক্রান্তজনকে কিছু-না-কিছু পড়তেই হবে। পড়ার কিছু না থাকলে

মনে হবে, মরে যাই। অতি অল্পবয়সে আমি এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলাম। প্রচণ্ড পড়ার ক্ষুধা। পড়ার বই নেই। বাবার সমস্ত বই তালাবন্ধ। কারণ সবই বড়দের বই। পড়ার বয়স হয় নি।

আমাদের শৈশবে পড়ার বইয়ের বাইরের সব বইয়ের সাধারণ নাম আউটবুক। ছাত্রদের জন্যে আউট বুক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ আউট বুক দু'টো কাজ করে—

সময় হরণ করে।

চরিত্র হরণ করে।

আমরা তখন থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। আমাদের সঙ্গে এক চাচা এবং এক মামাও থাকেন। তাঁরা সিলেট MC কলেজের ছাত্র। তাদের প্রধান কাজ প্রতি বছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়া এবং ফেল করা। মাঝে মাঝে তারা গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে আসেন এবং এমন এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন যে, খুঁজে বের করতে শার্লক হোমস লাগে।

একদিন খুঁজে পেয়ে গেলাম। তারা বই লুকিয়ে রাখেন বালিশের ওয়ারের ভেতর। একদিন সেখান থেকে একটা বই উদ্ধার করলাম। বইয়ের নাম *দুটি বৃন্তে একই ফুল*। মলাটে গাছের দুই শাখায় নয়নতারা ফুলের মতো ফুল। ফুলের ভেতরে দু'টা মেয়ের মুখ। খাটের নিচে বসে লুকিয়ে বই পড়ে ফেললাম। কাহিনী হচ্ছে, দুই বোন একই সঙ্গে এফ এ ক্লাসে পড়ছে এমন একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে। দু'টি মেয়ের চোখেই বিজলি জ্বলে। বিজলি একটা ভয়াবহ জিনিস। বিজলির পরপরই বজ্রপাত। এই বিজলি মেয়ে দু'টির চোখে কেন জ্বলে কিছুই বুঝলাম না।

এ ছাড়াও ব্যাপার আছে, মেয়ে দুটির বুকে বুনোফুল প্রস্ফুটিত হবার জন্যে অপেক্ষায়। বুকে ফুল কীভাবে ফুটবে সেটা আরেক রহস্য।

খাটের নিচে বসে আমি নিষিদ্ধ বই পড়ছি, খবরটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মা তালপাতার পাখা দিয়ে মেরে কঠিন শাস্তি দিলেন। আমার এই গুরুতর অপরাধ উচ্চ আদালতে (বাবার কাছে) পেশ করলেন। বাবা তার পরদিনই আমাকে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরির সদস্য করে দিলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম সেই বিশাল লাইব্রেরির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা জানালা আমার সামনে খুলে গেল। জানালা দিয়ে আসা অলৌকিক আলো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

www.MurchOna.com

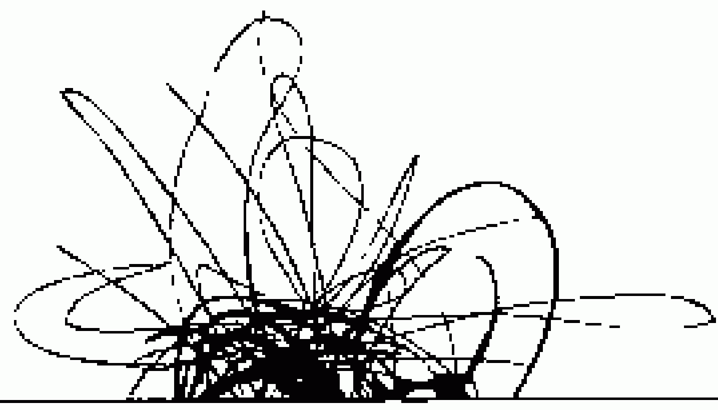

Everyone who works in the domain of fiction is a bit crazy. The problem is to render this craziness interesting.

– Francois Truffaut.

'সুনীল সাগর' বাক্যটা সুন্দর। 'স'-এর অনুপ্রাস আছে। বাক্যের দু'টা শব্দই তিন অক্ষরের বলে প্রচ্ছন্ন ছন্দের দোলা আছে। বাক্যটি সাগরের গুণ প্রকাশ করছে। 'সুনিলিত সাগরিত' বাক্যটায় কী বোঝাচ্ছে ? সম্পূর্ণ অর্থহীন একটা বাক্য না ? বছর ত্রিশ আগে আমরা ঠিক করলাম, একটা পারিবারিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করব। দেয়াল পত্রিকার নাম হবে 'সুনীল সাগর'। আমি সেই নাম পাল্টে নাম দিলাম 'সুনিলিত সাগরিত'। সম্পূর্ণ অর্থহীন নাম।

আমি প্রধান সম্পাদক। জাফর ইকবাল, আহসান হাবীব ছিল পত্রিকার অঙ্গসজ্জার দায়িত্বে। পনেরো দিন পর পর ঢাউস এক কাগজে সবার লেখা ছাপা হতো। কেউ বাদ যেত না। *সুনিলিত সাগরিত* পত্রিকাটি আমাদের পারিবারিক ধারাবাহিক ইতিহাস। আমার নিজের লেখালেখির ইতিহাস। আমার দুই ভাইয়ের লেখালেখিরও ইতিহাস। দুই বোন সুফিয়া ও শিখুও ভালো লিখত। তারা কেন জানি এই পারিবারিক পত্রিকার বাইরে নিজেদের প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকল।

দেয়াল পত্রিকার প্রকাশনা অতি সঙ্গত কারণেই ছিল অনিয়মিত। একটা পর্যায়ে প্রকাশনা হয়ে দাঁড়াল পারিবারিক বিশেষ বিশেষ ঘটনানির্ভর। পরিবারের একজন সদস্যের বিয়ে হচ্ছে, সেই উপলক্ষে প্রকাশনা। কেউ প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে যাচ্ছে বা কারো প্রথম সন্তানের জন্ম হচ্ছে, সেই উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা। *সুনিলিত সাগরিতে*র সর্বশেষ সংখ্যাটি বের হয় আমার বড় মেয়ে নোভা আহমেদের বিয়ে উপলক্ষে। পরিবারের বাইরের কারো লেখাই এখানে প্রকাশের নিয়ম নেই। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা ছিল ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নোভাকে আশীর্বাদ জানিয়ে যে চারটি লাইন লিখেছিলেন তা পত্রিকায় ঢোকানো। তা সম্ভব হয় নি। সংসার ছেড়ে বাইরে চলে আসার কারণে পত্রিকাটির ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমি নিজে যে লেখাটি লিখেছিলাম সেটিও প্রকাশ হবে কিনা তা নিয়েই শঙ্কিত ছিলাম।

www.MurchOna.com

আমি আমার বড় মেয়ের বিয়েতে বিশেষ কোনো উপহার দিতে চেয়েছিলাম। শাড়ি, গয়না, ফ্রিজ, টিভির বাইরে কিছু। কী দেয়া যায় কী দেয়া যায় ? নোভার অতি প্রিয় লেখকের নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নোভার বিয়ের আসরে তার প্রিয় লেখককে উপস্থিত করলে কেমন হয় ? এই উপহারটি হয়তো তার পছন্দ হবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ জানালাম। তাঁদের বললাম, মেয়ের বিয়েতে gift হিসেবে তাঁদের প্রয়োজন । আমাকে অবাক করে দিয়ে দুজনেই চলে এলেন। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি বিয়ের আসর বিডিআর-এর দরবার হলে উপস্থিত হলেন। নোভা তার বরকে নিয়ে স্টেজে বসে ছিল। বিয়ের এবং উৎসবের উত্তেজনায় সে খানিকটা দিশেহারা। আমি বললাম, মা, তোমার বিয়ের গিফট দেখে যাও। নোভা তার অতি প্রিয় লেখককে বিয়ের আসরে উপস্থিত দেখে চমকে উঠল।

পাঠক কি ধরতে পেরেছেন মানুষকে চমকে দেয়ার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে আছে ? সৃষ্টিশীল সমস্ত কর্মকাণ্ডে 'চমক' একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। আমরা কখন চমকাই ? সচরাচর যা ঘটে না তা ঘটতে দেখলে চমকাই।

একজন Fiction writer চমকের ব্যাপারটি কিন্তু তাঁর মাথায় রাখেন, কেউ অবচেতনভাবে এই কাজটি করেন, আবার কেউ সচেতনভাবেই করেন। যেমন জর্জ বার্নাড শ। লেখালেখির সময় সচেতন এবং অবচেতনভাবে অনেক কিছু করতে হয় বলেই এই কর্মটি অতীব জটিল।

> Writing is a dog's life, but the only life worth living.
>
> – Gustave Flauvert.
>
> লেখকের জীবন হলো কুকুরের জীবন, কিন্তু এই একমাত্র অর্থবহ জীবন।

অধ্যাপনা ছেড়ে আমি একসময় কুকুরের জীবন বেছে নেব তা কখনো ভাবি নি। এক দুপুরের কথা। বয়স উনিশ। মন আবেগে পূর্ণ। ইউনিভার্সিটি ছুটি হয়েছে। ছুটি কাটাতে বরিশালের পিরোজপুরে গিয়েছি। একগাদা chemistry বই নিয়ে গেছি। আগামীকাল থেকে পড়তে শুরু করব, এই ভেবে ভেবে সময় কাটাচ্ছি। বইয়ের পাতা খোলা হচ্ছে না। বিকালে কেমন যেন অস্থির লাগে। আমি হাঁটতে বের হই। হুলারহাটের দিকে এগুতে থাকি। প্রথমেই একটা কবরখানা পড়ে। গাছপালায় ঢাকা এমন সুন্দর একটা জায়গা। একদিন কবরখানার ভেতরে ঢুকলাম। অবাক কাণ্ড, কবরখানার ভেতর টলটলে পানির ছোট্ট একটা পুকুর। পুকুরের পাশে শ্যাওলা ধরা এক কামরার মসজিদ। ভাঙা ঘাট। ভাঙা ঘাটে অতি

www.MurchOna.com

বৃদ্ধ একজন (সম্ভবত মসজিদের ইমাম, কবরখানার কেয়ারটেকার) আমাকে দেখে বললেন, কী চান বাবা ?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

কবরখানায় ঘুরতেছেন কেন ?

বেড়াচ্ছি।

বাবা, এইটা কি কোনো বেড়ানোর জায়গা ? আছরের ওয়াক্ত হয়েছে, আসেন নামাজ পড়ি।

আমি বললাম, আমার অজু নাই।

পুকুরে পানি আছে। অজু করেন।

বৃদ্ধ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। একবার ইচ্ছা করল দৌড়ে পালিয়ে যাই। কেন জানি সাহসে কুলাল না। বৃদ্ধ অজু করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।

অজু কীভাবে করতে হয় জানেন ?

জানি।

অজুর দোয়া জানেন ?

জি-না।

থাক, দোয়া লাগবে না। অজু করে আসেন। একত্রে নামাজ পড়ি।

আমি অজু করলাম এবং বৃদ্ধকে নিয়ে অন্ধকার মসজিদে ঢুকলাম। আসরের নামাজের দোয়া মনে মনে পড়তে হয়। বৃদ্ধ কিন্তু শব্দ করে পড়ছেন। সূরা ফাতিহার পর তিনি অতি দীর্ঘ একটা সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। ভয়ে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। দ্রুত অন্ধকার নামছে। চারদিকে কবর। পুকুরের পানিতে কেউ সাঁতরাচ্ছে এমন শব্দ হচ্ছে। নামাজের শেষে তিনি দীর্ঘ দোয়ায় বসলেন। এই দোয়া কোনোদিন শেষ হবে— আমার এরকম মনে হলো না। নামাজে সালাম ফেরানোর একটা ব্যাপার আছে। একবার ডানে একবার বামে সালাম দিতে হয়। এই অতি বৃদ্ধ মাওলানা দোয়ার মধ্যেও কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে সালাম ফেরাচ্ছেন। পাগল না তো!

ঠিক মাগরেবের আগে আগে বৃদ্ধ দোয়া শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যান বাড়িত যান।

আমি বললাম, আপনি একা একা এখানে থাকেন ?

হুঁ।

www.MurchOna.com

একাই নামাজ পড়েন ?

বৃদ্ধ বললেন, একাই নামাজ পড়ি। তবে মাগরেব এবং এশার ওয়াক্তে অনেক জিন আমার সঙ্গে নামাজ পড়ে। সূরা পাঠে ভুল করলে তারা লোকমা দেয়।

আমি দ্রুত বের হয়ে এলাম। মাগরেবের ওয়াক্তের বাকি নাই। জিনরা সম্ভবত আসতে শুরু করেছে।

আমার বৈকালিক ভ্রমণে পিরোজপুর গোরস্থান একটি বিশেষ জায়গা দখল করে ফেলল। প্রায়ই সেখানে যাই, কবরের গায়ে লেখা নামগুলি পড়ি। বৃদ্ধ কেয়ারটেকারকে দেখি কবর পরিষ্কার করছেন। ঝোপঝাড় কাটছেন। তিনি আর কখনো আমাকে নামাজ পড়তে ডাকেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা তেমন হতো না। একদিন শুধু বললেন, আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন কি এখানে আছেন ?

আমি বললাম, না।

তাহলে রোজ আসেন কেন ?

আমি চুপ করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাপাকের কোনো ইশারা আছে বইল্যাই আপনে আসেন।

জানি না কাকতালীয় ব্যাপার কি-না, মিলিটারির হাতে নিহত আমার বাবার কবর হয় এই পিরোজপুরের গোরস্থানেই।

কবরস্থান-বিষয়ক অংশটি বিস্তারিত লেখার একটা কারণ আছে। আমি একদিন কবরস্থান থেকে ফিরেই প্রথম উপন্যাস লেখায় হাত দিই। সন্ধ্যাবেলা আয়োজন করে Chemistry-র বই বের করে পড়তে বসি। খাতায় লেখি— The term 'macromolecule' was first suggested by Staudinger.

এইটুকু লিখেই পরের লাইনে লিখলাম— বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলাম।

Macromolecule-এর সঙ্গে বাসের কোনোই সম্পর্ক নেই। তারপরেও কেন লিখলাম!

বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাসার সামনে বিশাল পুকুর। পুকুর থেকে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির শব্দ আসছে। পিরোজপুর শহরে বৃষ্টি হওয়া মানেই কারেন্ট চলে যাওয়া। আমি সিরিয়াসলি পড়ছি ভেবেই আমার সামনে হারিকেন দেয়া হয়েছে। আমার মাথার ভেতর একের পর এক লাইন আসছে। এক ধরনের অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি লিখতে শুরু করেছি আমার প্রথম উপন্যাস— *শঙ্খনীল কারাগার*।

www.MurchOna.com
==

> বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সব। রাস্তায় পানির ধারা স্রোত। লোকজন চলাচল করছে না, লাইটপোস্টের বাতি নিবে আছে। অথচ দশ মিনিট আগেও যেখানে ছিলাম সেখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। শুকনা খটখট করছে চারদিক। কেমন অবাক লাগে ভাবতে, বৃষ্টি এসেছে, ঝুপ ঝুপ করে একটা ছোট্ট জায়গা ভিজিয়ে চলে গেছে। আর এতেই আশৈশব পরিচিত এ অঞ্চল কেমন ভৌতিক লাগছে। হাঁটতে গা ছমছম করে।

শঙ্খনীল কারাগার আমার প্রথম লেখা উপন্যাস, যদিও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *নন্দিত নরকে*। আমার পরম সৌভাগ্য, আমার বাবা *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে যেতে পেরেছেন। সেই গল্প আরেকদিন করব।

www.MurchOna.com

উনিশ বছর বয়সের অনেক তরুণ-তরুণী উপন্যাস লিখেছে। এটা এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার না। যেটা উল্লেখ করার মতো সেটা হচ্ছে, আমি লিখেছি খুব দ্রুত। তিন রাতের বেশি সময় লেগেছে বলে আমার মনে হয় না। উপন্যাস শেষ করেছি মধ্যরাতে। শেষ করার পর পর মনে হয়েছে— ইশ, কাউকে যদি পড়াতে পারতাম! এমন সুন্দর একটা গল্প। কেউ জানবে না ?

সুন্দর একটা গল্প বলেছি এটা বুঝতে পারছিলাম। লেখার সময় প্রতিটি চরিত্র চোখের সামনে ভাসছিল। রাবেয়া আপা অনেকবার আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছেন, প্রতিবারই তার কাচের চুড়ির শব্দ শুনেছি। কিটকি গায়ে চমৎকার সেন্ট মাখে। যতবার কিটকির কথা লিখেছি, ততবারই সেন্টের গন্ধ পেয়েছি। উপন্যাসের কিছু কিছু জায়গা লেখার সময় টপটপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়েছে।

গল্প ভালো লিখেছি বুঝতে পারছি, কিন্তু উপন্যাস কি হয়েছে ? উপন্যাস লেখার নিশ্চয়ই অনেক নিয়মকানুন আছে। আমি তো কিছুই জানি না।

উপন্যাস লেখার বিষয়ে সমারসেট মম বলেছেন— There are three rules for writing the novel. Unfortunately no one knows what they are.

তিন মাসের জন্য লেখালেখি শেখার একটা স্কুলে আমি ক্লাস করেছিলাম। আমার আগে সেই স্কুলে পশ্চিমবঙ্গের আরেক ঔপন্যাসিকও ক্লাস করেছেন। তাঁর নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্কুলটা হলো আমেরিকার আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্রিয়েটিভ রাইটিং ফ্যাকাল্টি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই স্কুল থেকে কিছু শিখতে পেরেছিলেন কি-না আমি জানি না। আমি কিছুই শিখতে পারি নি।

মনে আছে একদিন আমাদের শিক্ষক Idea বিষয়ে এক ঘণ্টার ক্লাস নিলেন। তিনি বললেন, কীভাবে Idea লালন করতে হয়। Idea-র পূর্ণতার জন্য সময় দিতে হয়।

তারপর Idea-কে প্রকাশের উপায়গুলো নিয়ে ভাবতে হয়।

আমি মহাবিরক্ত হয়ে উসখুস করছি। শিক্ষকের সেটা চোখ এড়াল না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডক্টর আহমেদ (সব ছাত্রের নাম তিনি জানতেন), আইডিয়া বিষয়ে তোমার কি কিছু বলার আছে ?

www.MurchOna.com

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পরিষ্কার গলায় বাংলায় বললাম,

শিল্পীর শিরে কিলবিল করে আইডিয়া
উইপোকা বলে, চল ভাই তারে খাই গিয়া।

শিক্ষক বললেন, What does it mean ?

আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁকে শোনাব, উইপোকার ইংরেজি কিছুতেই মাথায় আসছে না। শেষটায় বললাম—

Creative person's head is full with ideas
Little bugs say, let us eat them.

তিনি হতাশ গলায় বললেন, এখনো বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, আইডিয়া হলো ক্ষুদ্র পোকাদের আহার। এর বেশি কিছু না।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। প্রথম উপন্যাস ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখন কী করা যায় ? আমি বাবার অফিসের ফাইলের নিচে গোপনে রেখে চলে এলাম। বাবা ফাইল দেখতে দেখতে পাণ্ডুলিপি পেয়ে যাবেন। এবং অবশ্যই আগ্রহ নিয়ে পড়বেন।

বাবার অফিস ছিল আমাদের বাসারই একটা কামরা। ফাইলপত্রে ঠাসা একটা ঘর। বাবার মাথার ওপর বিশাল এক টানা পাখা। রশিদ নামের একজন ছিল সরকারি পাংখাপুলার। তার কাজ মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় যন্ত্রের মতো পাখার দড়ি টেনে যাওয়া। *অয়োময়* নাটক লেখার সময় আমি একটি পাংখাপুলারের চরিত্র এনেছিলাম। বাবার পাংখাপুলার রশিদের প্রচ্ছন্ন ছায়া হয়তো তার মধ্যে ছিল।

আমি রশিদকে গোপনে বলে এলাম, যদি দেখো বাবা ফাইল বাদ দিয়ে নীল রঙের একটা খাতা পড়তে শুরু করেছেন তাহলে আমাকে খবর দেবে। রশিদ দাঁত বের করে বলল, নিশ্চিন্ত থাকেন।

টেনশান নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। রশিদ কোনো খবর দিচ্ছে না। দুপুরে খাবার সময় বাবাকে ভেতরে এসে খেতে বলা হলো। বাবা বললেন, দেরি হবে। এই সময় রশিদ এসে আমাকে চোখ টিপ দিয়ে বলল, নীল খাতা! আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

একসময় বাবা এসে গম্ভীর ভঙ্গিতে দুপুরের খাবার শেষ করলেন। আমার লেখা বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। সন্ধ্যাবেলা মাগরেবের নামাজ শেষ করে মা'কে ডেকে বললেন, আল্লাহপাক তোমার বড় ছেলেকে লেখক বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বাবা রাতে আমার হাতে একতোড়া কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে একটা নাটক আছে। রেডিও নাটক। আমি লিখেছি। নাম— 'কত তারা আকাশে'। ঢাকা বেতারের একজন প্রডিউসারের বাড়ি পিরোজপুরে। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, নাটক ভালো হলে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। তুই নাটকটা পড়ে দেখ। কোনো পরিবর্তন লাগলে করে ফেলবি।

আমি মহানন্দে নাটক কাটাকাটি করতে লাগলাম। একসময় জিনিস যা দাঁড়াল, তাকে আর বাবার লেখা নাটক বলা যায় না। বাবা নাটক পড়ে বললেন, অসাধারণ জিনিস দাঁড় হয়েছে। নাটক জমা দেয়া হলো। প্রডিউসার সাহেব আশ্বাস দিলেন, প্রচার হবে, তবে দেরি হবে।

দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার কারণে সব এলোমেলো হয়ে গেল। পিতাপুত্রের যৌথ নাটক প্রচার হলো না।

ছুটি শেষ হয়ে গেল। আমি বাক্সভর্তি কেমিস্ট্রি বই নিয়ে ঢাকায় ফিরলাম। *শঙ্খনীল কারাগারের* পাণ্ডুলিপি ফেলে এলাম। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে রাখার কিছু নেই। বই হিসাবে *শঙ্খনীল কারাগার* প্রকাশিত হবে, পাঠক পড়বে, কোনো একদিন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় সেই উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র বানাবে। সেই চলচ্চিত্র দেশে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সম্মান পাবে, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পাবে Honourable mention— এইসব কিছুই উনিশ বছরের যুবকটি জানত না।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে পিরোজপুরে বাবার কবর জিয়ারত করতে গেলাম। মা এবং ভাইবোনরা খুব কান্নাকাটি করল। অদ্ভুত কোনো কারণে আমার চোখে পানি এল না। তাদের বাসায় রেখে সন্ধ্যাবেলা আমি আবার কবরস্থানে গেলাম। আমার সঙ্গে দু'টা বই *নন্দিত নরকে, তোমাদের জন্যে ভালোবাসা*। নিতান্তই ছেলেমানুষের মতো বই দু'টা কবরের ঝোপঝাড়ের ভেতর রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। মনে মনে বললাম, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

বাবার কবরে শ্বেতপাথরে এই দু'টা লাইনই লেখা।

প্রায়ই ভাবি, আমার নিজের কবরে এপিটাফ হিসেবে কী লেখা থাকবে ? লেখাটা কি আমিই লিখব ? নাকি অন্য কেউ আমার হয়ে লিখে দেবে ?

গায়ক আব্বাসউদ্দিনের কবর আজিমপুর গোরস্থানে। সেখানে এপিটাফ হিসাবে তাঁর অতি বিখ্যাত গানের চরণ লেখা—

বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া কয়া যাও।

www.MurchOna.com

যে ক'বার দেখেছি মনের ভেতরে গান গুনগুন করে উঠেছে।

এমন সুন্দর কোনো কিছু কেউ কি লিখবে আমার জন্য ? কোনো পত্রিকা কি কোনো শোকগাথা প্রচার করবে ? তারা কী লিখবে ?

William Faulkner বলেছেন, একজন লেখকের obituary হওয়া উচিত এক লাইনের :

He wrote books, then he died.

মানুষটা বই লিখেছে, তারপর মারা গেছে।

বাহ্ চমৎকার। এর চেয়েও সুন্দর একটা কথা লিখি ?

আমার প্রিয় লেখক Jorge Luis Borges বলেছেন— When writers die they become books, which is after all, not too bad an incarnation.

মৃত্যুর পর লেখকরা বই হয়ে যান।

এরচেয়ে ভালো আর কী হতে পারে ?

পুনশ্চ : আমি যে পিতৃভক্ত ছেলে এই তথ্যটা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পাঠকরা জেনেছেন। অতি সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন পিতৃভক্ত একজন ছেলে ত্রিশ বছর পর বাবার কবর দেখতে যায় কীভাবে ? ঢাকা থেকে পিরোজপুর যেতে আট ঘণ্টা লাগে।

প্রশ্নটার জবাব আমার কাছে নেই।

সবার ব্যস্ততা। কেউ সময় বের করতে পারে না। কত কিছু। আমরা জটিল আধুনিক এক জগতে বাস করি।

তারপরেও ত্রিশ বছর পর হঠাৎ সবাইকে জড়ো করে কেন কবরস্থানে গেলাম গল্পটা বলা দরকার। এই গল্পে সামান্য Supernatural touch আছে।

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে 'সবুজ সাথী' নামের প্রেসক্রিপসন নাটক নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই সিরিয়ালটির লেখক এবং পরিচালক যেহেতু আমি, আমাকেও প্রতিটি অনুষ্ঠানে থাকতে হচ্ছে। খুলনার অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা যাচ্ছি বরিশালে। গাড়ি করে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছেন আসাদুজ্জামান নূর, জাহিদ হাসান এবং অভিনেত্রী-গায়িকা শাওন। ত্রিশ বছর পর এই অঞ্চলে প্রথম যাত্রা। সবকিছু বদলে গেছে। আমি যাচ্ছি ঘুমুতে ঘুমুতে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। আমি প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান। গাড়ি থামান।

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, সমস্যা কী, শরীর খারাপ লাগছে ?

আমি বললাম, শরীর খারাপ না, তবে কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে আমি অতিপরিচিত জায়গায় এসেছি।

www.MurchOna.com

গাড়ি থামল। আমি ঘোরলাগা অবস্থায় গাড়ি থেকে নামলাম। কিছুই চিনতে পারছি না। খুলনা-বরিশাল হাইওয়ের একটি অংশে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিব্রত ভঙ্গিতে বললাম, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে খুব কাছে কোথাও আমার বাবার কবর।

জাহিদ বলল, কী বলেন হুমায়ূন ভাই?

শাওন বলল, উনি যখন বলছেন তখন একটু খুঁজে দেখলে হয়।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। একজন বলল, সামান্য পেছনে গেলেই পিরোজপুর গোরস্থান। আমি সবাইকে নিয়ে গোরস্থানে ঢুকলাম। আমরা কবর জিয়ারত করলাম। শাওন বলল, আমি আমার জীবনে অতি রহস্যময় একটা ঘটনা দেখলাম। ছেলে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বাবা ছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

সব ঘটনার পেছনেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে। আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ার পেছনেও নিশ্চয়ই কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। থাকলেও আমি তা জানি না।

বরিশালের অনুষ্ঠান শেষ করে ঢাকায় ফিরেই আমি সব ভাইবোন এবং মাকে নিয়ে পিরোজপুর গোরস্থানে এসে উপস্থিত হলাম।

www.MurchOna.com

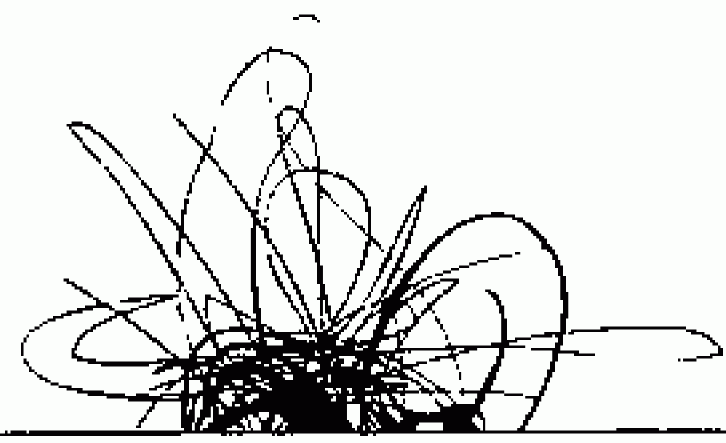

When I'm writing I'm always aware that this friend is going to like this, or that another friend is going to like that paragraph or chapter, always thinking of specific people. In the end all books are written for your friends.

— Gabriel Garcia Marquoz

ঢাকা শহরে একজন 'হন্টন পীর' আছেন। তাঁর একমাত্র কাজ সারাদিন হাঁটা। একা হাঁটেন না। ভক্তদের নিয়ে হাঁটেন। একজন বাবার মাথায় ছাতা ধরে থাকে। একজনের হাতে থাকে পানির বোতল। অন্য একজনের হাতে কলার কাঁদি। বাবা খুব সম্ভব কলার ভক্ত। আমি বেশ কয়েকবার দূর থেকে এই হন্টন বাবাকে লক্ষ করেছি। একবার মিনিট পাঁচেক বাবার আশেপাশেই ছিলাম। উদ্দেশ্য বাবার ঘটনাটা কী জানা। বাবার জনৈক ভক্ত আমাকে চিনে ফেলে অবাক হয়ে বলল, আপনি বাবার কাছে কী চান? আমি বললাম, গল্প চাই!

আমি আমার যৌবনে হন্টন পীরের মতো একজনকে পেয়েছিলাম। আমরা দলবেঁধে তাঁর পেছনে হাঁটতাম। তিনি যদি কিছু বলতেন মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। গভীর রাতে নীলক্ষেত এলাকায় তিনি হাঁটতে হাঁটতে আবেগে অধীর হয়ে দুই হাত তুলে চিৎকার করতেন। 'আমার বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ!' আমরা গভীর মুগ্ধতায় তাঁর আবেগ এবং উচ্ছ্বাস দেখতাম। তাঁর নাম আহমদ ছফা। আমাদের সবার ছফা ভাই।

ছফা ভাই ছিলেন আমার Mentor. এই ইংরেজি শব্দটির সঠিক বাংলা নেই। Mentor এমন গুরু যার প্রধান চেষ্টা শিষ্যকে পথ দেখিয়ে উঁচুতে তোলা। ছফা ভাই শুধু যে একা আমার Mentor ছিলেন তা না, অনেকেরই ছিলেন।

দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। শিশু রাষ্ট্র জন্মের যন্ত্রণায় তখনো ছটফট করছে। আর ছফা ভাই ছটফট করছেন আবেগে এবং উত্তেজনায়। কত অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনা তাঁর মাথায়। দেশকে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে এভারেস্ট শিখরের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। দেশ মেধা এবং মননে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। ইত্যাদি।

www.MurchOna.com

ছফা ভাই এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর উত্তেজনা নিমিষে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আমরাও ছফা ভাইয়ের মতোই উত্তেজিত হই। কল্পনায় ভাসে ভবিষ্যতের অপূর্ব বাংলাদেশ।

ছফা ভাই সাপ্তাহিক একটা পত্রিকা বের করে ফেললেন। নিজেই সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রধান লেখক। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, গল্প লেখা শুরু করে দাও। রোজ রাতে একটা করে গল্প লিখতে হবে। আমার পত্রিকায় নিয়মিত গল্প ছাপা হবে। ছফা ভাইয়ের কথা মানেই আদেশ। আমি রাত জেগে গল্প লিখে ফেললাম। আজ আর সেই গল্পের নাম মনে নেই। গল্প কী লিখেছিলাম তাও মনে নেই। ছফা ভাইয়ের পত্রিকাটার কথাও মনে নেই। দুই-তিন সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ছফা ভাই তখন দারুণ অর্থকষ্টে। থাকার জায়গা নেই। ক্ষীণ সম্ভাবনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে সিট পাবেন। পাচ্ছেন না। একদিন আমি ছফা ভাইকে ভয়ে ভয়ে বললাম, হলে সিট না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের বাসায় কি থাকবেন ?

আমার মা তখন বাবর রোডে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্ত্রী হিসাবে একটা বাড়ির দোতলাটা বরাদ্দ পেয়েছেন। সেখানে না আছে পানির ব্যবস্থা, না আছে কিছু। ছফা ভাই আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন। আমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় কামরাটা ছেড়ে দিলাম। মা তাঁর নিজের সন্তানদের যে মমতায় দেখেন, একই মমতা ছফা ভাইয়ের দিকেও প্রসারিত করলেন।

ছফা ভাই বাইরে-বাইরেই থাকতেন, রাতে এসে শুধু ঘুমাতেন। বেশির ভাগ সময় বাইরে থেকে খেয়ে আসতেন। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া পরিবারটির ওপর বাড়তি চাপ হয়তো দিতে চান নি।

প্রতিদিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ছফা ভাই কিছু সময় মা'র সঙ্গে কাটাতেন। গত রাতে যেসব স্বপ্ন দেখেছেন তা মাকে বলতেন। মার দায়িত্ব স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। আমার ধারণা, ছফা ভাই স্বপ্নগুলি বলতেন বানিয়ে বানিয়ে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে মাকে খুশি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ হলো, ছফা ভাইয়ের স্বপ্নগুলিতে ডিটেলের কাজ খুব বেশি থাকত। স্বপ্নে এত ডিটেল থাকে না। একটা স্বপ্ন বললেই পাঠক বুঝতে পারবেন—

কাকিমা, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম দুটা কাক। একটা বড় একটা ছোট। ছোট কাকটার একটা নখ নেই। তার স্বভাব চড়ুই পাখির মতো। তিড়িং-বিড়িং করে সে শুধু লাফায়। বড়টা শান্ত স্বভাবের। সে একটু পর পর হাই তোলার মতো করে। তাদেরকে ধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ ধান খাচ্ছে না। ধানগুলি

ঠোঁটে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিচ্ছে। এখন কাকিমা, বলুন, স্বপ্নটার অর্থ কী ? আমি বিরাট চিন্তায় আছি।

বলতে ভুলে গেছি, আমার প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* কিন্তু এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ছফা ভাই। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির খান সাহেবকে পাঠিয়ে এই কাজটা করা। তখন তিনি লেখক শিবির নামক সংগঠনের প্রধান। তিনি লেখক শিবির থেকে *নন্দিত নরকে* উপন্যাসকে বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে পুরস্কারও দিয়ে দিয়েছেন। আমি অতি তরুণ ঔপন্যাসিক। আমার ওপর ছফা ভাইয়ের অনেক আশা। তাঁর ধারণা, আমি অনেকদূর যাব। তিনি চেষ্টা করছেন আমার অনেকদূর যাত্রার পথ যেন সুগম হয়।

ছফা ভাই ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে সিট পেলেন। তিনি উঠে এলেন হোস্টেলে। আমি থাকি মুহসীন হলে। নিয়ম করে আমি এবং আমার বন্ধু আনিস সাবেত প্রতি রাতে তাঁর কাছে যাই। গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়। আড্ডা মানে ছফা ভাই কথা বলেন, আমরা দুজন শুনি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কথা। তিনি মহাকবি গ্যাটের রচনার বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছেন। অনুবাদ পড়ে শোনান।

একবার তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি বিশাল এক বাদ্যযন্ত্র কিনেছেন। সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস। দেখতে নিচু আলমারির মতো। ছফা ভাই জানালেন, প্রতি রাতেই তাঁর মাথায় নানা ধরনের সুর আসছে। সুর ধরে রাখার জন্যই এই বাদ্যযন্ত্র।

আমি বললাম, ছফা ভাই! আপনি বাজাতে পারেন ?

ছফা ভাই বললেন, অবশ্যই পারি।

তিনি বাদ্যযন্ত্রটার রিড টিপতে লাগলেন। বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। তিনি পায়ে তাল দিচ্ছেন এবং মাথা নাড়ছেন।

এই সময় তিনি গান লিখতে শুরু করলেন। গান লিখে সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়ে দেন। আমি এবং আনিস সাবেত অবাক হয়ে সেই সঙ্গীত শুনি।

হঠাৎ একদিন শুনি ছফা ভাই দেশে নেই। গাদ্দাফির নিমন্ত্রণে লিবিয়া চলে গেছেন। লিবিয়ায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরলেন। তাঁর মাথায় রঙিন গোল টুপি। আমাদের জানালেন, গাদ্দাফি নিজের হাতে তাঁর মাথায় এই টুপি পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গাদ্দাফির *গ্রিন বুক* অনুবাদের। ছফা ভাইয়ের অনেক কথাই কল্পনারাজ্যের। তবে এই কথাটা হয়তো ঠিক। ছফা ভাইয়ের হাতে টাকাপয়সার নড়াচাড়া দেখা গেল। তিনি একটা প্রেস কিনে

www.MurchOna.com

ফেললেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রেস উঠেও গেল। ছফা ভাই কাঁধে একটা টিয়া পাখি নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। তিনি নাকি টিয়া পাখির অনেক কথা বুঝতে পারেন।

একটা পর্যায়ে আমার ক্ষীণ সন্দেহ হওয়া শুরু হলো যে, তিনি যে জগতে বাস করেন তা সম্পূর্ণই তাঁর নিজের। বাস্তব জগৎ থেকে অনেকটা দূরের। তাঁর রিয়েলিটি এবং আমাদের রিয়েলিটি এক নয়।

কারো যখন মোহভঙ্গ হয় তখন অতি দ্রুতই হয়। আমি তাঁর বলয় থেকে সরে গেলাম। আনিস সাবেত পিএইচডি করার জন্য আমেরিকা চলে গেলেন। ছফা ভাই তাঁর জন্য নতুন বলয় তৈরি করলেন। তিনি শূন্যস্থান পছন্দ করেন না।

ছফা ভাইকে নিয়ে আমার অসংখ্য স্মৃতি আছে। তাঁর ওপর দুশ' পাতার একটা বই আমি অবশ্যই লিখতে পারি। এখানে একটি স্মৃতি উল্লেখ করছি। ১৯৮৫ বা '৮৬ সালের কথা। এতদিন লেখালেখির জগতে থেকেও ছফা ভাই বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান নি। আমি পেয়েছি অথচ ছফা ভাই পান নি, খুবই লজ্জিত বোধ করি। কীভাবে কীভাবে আমি তখন বাংলা একাডেমীর কাউন্সিলারদের একজন। পুরস্কার কমিটিতে আছি। আমি জোরালোভাবে ছফা ভাইয়ের পুরস্কারের ব্যাপারটা বললাম। যথারীতি তা নাকচও হয়ে গেল। আমি ছফা ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করেছি— এই খবর ছফা ভাইয়ের কানে পৌঁছল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর বাসায় উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, হুমায়ূন, আপনার এত বড় স্পর্ধা যে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করেন!

আমি চেয়ারে বসেছিলাম। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

ছফা ভাই বললেন, আমি বসতে না বলা পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

আপনি আর কখনোই আমার বাসায় আসবেন না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

ছফা ভাইয়ের সঙ্গে এটাই সম্ভবত আমার শেষ দেখা। ভুল বললাম, আনিস সাবেত ক্যান্সারে মারা যাওয়ার সংবাদ দিতে আমি আরো একবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর 'আনিসরে' 'আনিসরে' বলে চিৎকার করে কাঁদলেন।

www.MurchOna.com

কান্না বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের ভুবনে ঢুকে গেলেন। চলে গেলেন রিয়েলিটির বাইরে। আনিস সাবেত ট্রাস্টি বোর্ড করতে হবে। সেই ট্রাস্টি দুস্থ লেখকদের বৃত্তি দেবে। দরিদ্র লেখকদের বই প্রকাশনার দায়িত্ব নেবে। ট্রাস্ট ফান্ড একটা আধুনিক স্কুল করবে টোকাইদের জন্য।

তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালক কারা কারা থাকবেন তাদের নাম লেখার জন্য। ট্রাস্টি বোর্ডের নীতিমালাও লিখতে হবে। তাঁকে দারুণ উত্তেজিত মনে হলো। তিনি লিখছেন, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি অন্যভুবনের মানুষটিকে।

আমাকে নিয়ে ছফা ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। আমি তাঁর কোনোটাই পূরণ করতে পারি নি। এত মেধা আমার ছিল না। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা বৃত্ত থাকে। কেউ সেই বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না। আমিও পারি নি। ছফা ভাই নিজেও পারেন নি। তাঁকে বন্দি থাকতে হয়েছে নিজের বৃত্তেই।

www.MurchOna.com

Why do people always expect authors to answer questions ? I am an author because I want to ask questions. If I had answers I'd be a politician.

—Eugene Lonesco

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির মালিক খান সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হলো। তিনি *নন্দিত নরকে* উপন্যাসের প্রুফ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বই ছোট হয়েছে। বড় করতে হবে।

আমি বললাম, আমার গল্পটাই তো এতটুকু।

খান সাহেব বললেন, উপন্যাস ফর্মা হিসেবে লিখতে হয়। ফর্মা বুঝেন তো ? ষোল পৃষ্ঠায় এক ফর্মা। আপনি একটা উপন্যাস লিখলেন তিন ফর্মা নয় পৃষ্ঠা। বাকি সাত পৃষ্ঠায় আমি কী করব ? কাগজ-কলম নিয়ে বসেন। এখানেই ঠিক করেন।

আমি বললাম, কোন জায়গাটা বড় করব বুঝতে পারছি না!

খান সাহেব বললেন, একটা কোর্ট সিন নিয়ে আসেন। উকিল মন্টুকে জেরা করছে এই রকম। এই, হুমায়ূন সাহেবকে কাগজ আর কলম দে।

আমি খান সাহেবের সামনেই ফর্মা মিলানোর জন্যে উপন্যাস বড় করতে শুরু করলাম। উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। তাহলে সত্যি সত্যি আমার বই বের হচ্ছে ?

বই বের হলো। দাম তিন টাকা। বইয়ের কভার আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল এবং ভাস্কর শামীম শিকদার দু'জনে মিলে করল। কয়েকজন মানুষ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। কভার করার নিয়মকানুন (ব্লক পদ্ধতি) দু'জনের কেউ জানে না। অতি অখাদ্য এক কভার হলো। মানুষগুলির একটা মুখেরও ব্লক ডিজাইন ঠিক হয় নি বলে নষ্ট হয়ে গেল।

খান ব্রাদার্স থেকে তখন সুন্দর সুন্দর কবিতার বই বের হচ্ছে। নির্মলেন্দু গুণের *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*। কবি আবুল হাসানের *রাজা যায় রাজা আসে*। এইসব বইয়ের কভার করেছেন কভার ডিজাইনের গ্র্যান্ড মাস্টার কাইয়ুম চৌধুরী।

নন্দিত নরকে বের হবার ছয় মাস পর খান সাহেব ডেকে পাঠালেন। হতাশ গলায় বললেন, বই তো কিছুই বিক্রি হচ্ছে না। পুশ সেল করেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে বেচেন।

www.MurchOna.com

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বইয়ের কভারটা কি চেঞ্জ করা যায় ? কাইয়ুম চৌধুরীকে দিয়ে...।

আমাকে অবাক করে খান সাহেব ড্রয়ার থেকে দুশ' টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন এবং বললেন, টাকাটা কাইয়ুম সাহেবকে দিয়ে বইয়ের কভার নতুন করে করতে বলেন। উনি কভারের জন্য দুশ' টাকা নেন।

শুরু হলো আমার অন্তহীন ঘোরাঘুরি। কাইয়ুম চৌধুরীর কাছে যাই, তিনি একটা তারিখে আসতে বলেন। সেই তারিখে যাই, তিনি আরেকটা তারিখ দেন। ধৈর্যে আমি রবার্ট ব্রুসকে হার মানালাম। হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেল। কভারের দেখা নেই।

একদিন খান সাহেব বললেন, আমি যাব আপনার সঙ্গে। আমি অন্য এক সূত্রে তাঁকে চিনি। সেটা উল্লেখ করে যদি কিছু হয়। আপনি পুলাপান মানুষ বলে উনি আপনাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। আমি একজন বয়স্ক মানুষ।

গেলাম খান সাহেবকে নিয়ে। ঘণ্টাখানিক বসে রইলাম। কাইয়ুম চৌধুরীর বসার ঘরে না। বসার ঘরের বাইরে ছোট্ট একটা ঘরে। কাইয়ুম চৌধুরী খবর পাঠালেন, তিনি একটা ডিজাইন নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত। ডিজাইনটা শেষ হলেই আসবেন। আরো দশ-পনেরো মিনিট লাগবে।

দশ-পনেরো মিনিট পর কাইয়ুম চৌধুরী বের হলেন না। ভয়ালদর্শন এক কুকুর বের হয়ে খান সাহেবের পা কামড়ে ধরল। আমি খান সাহেবকে কুকুরের হাতে ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। য পলায়তি স জীবতি।

সেই দিনই খান সাহেবকে তাঁর বাসায় দেখতে গেলাম। তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। নাভিতে ইনজেকশন শুরু হয়েছে। সান্ত্বনাসূচক কিছু কথা বলা দরকার। কোনো কথাই মাথায় আসছে না। খান সাহেব বললেন, কাইয়ুম চৌধুরীর হাত থেকে কভারের আশা ছেড়ে দিন। সামান্য কভারের জন্যে কুকুরের হাতে মৃত্যুর মানে হয় না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

খান সাহেব বললেন, আমি আপনার জন্যে দোয়া করলাম, আপনার বই কভার ছাড়া বের হলেও মানুষ যেন কিনে পড়ে।

কাইয়ুম চৌধুরী শেষ পর্যন্ত কভার করে দিয়েছিলেন। অপূর্ব কভার। কভার দেখে খান সাহেব কুকুরের কামড়ের দুঃখ ভুলে গেলেন।

কভার ডিজাইন হাতে পাওয়ার দৃশ্যটা বলি। কাইয়ুম চৌধুরী ডিজাইন হাতে বের হয়ে এলেন। আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে ছাপতে হবে। আমি বিদায় নিয়ে চলে আসছি, কাইয়ুম চৌধুরী বললেন, একটু দাঁড়ান। আমি দাঁড়ালাম।

www.MurchOna.com

কাইয়ুম চৌধুরী বললেন, কভারটা করার আগে আপনার উপন্যাসটা আমি পড়েছি। আপনার হবে।

আমি ধন্যবাদসূচক কিছু বলতে যাব তার আগেই তিনি বললেন, সামান্য ভুল বলেছি। 'আপনার হবে' না বলে বলা উচিত 'আপনার হয়েছে'।

এই বাক্যটি আমার লেখালেখি জীবনের প্রথম শোনা প্রশংসাসূচক বাক্য। উনিশ-কুড়ি বছরের একজন তরুণকে এই বাক্যটি কী আনন্দই না সেদিন দিয়েছিল!

আনন্দের কথা যখন এসেছে, তখন নিরানন্দের কিছু কথা আসুক। Ph.D করে ফিরেছি। পুরোদমে লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছি। অনেকগুলি বই বের হয়ে গেছে। পত্রপত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিতে খুবই আগ্রহী। কেউ ইন্টারভ্যু নিতে আসে না। হঠাৎ *বিচিত্রা* পত্রিকা থেকে ডাক পেলাম। তারা আমাকে এবং সৈয়দ শামসুল হককে নিয়ে একটা কভার স্টোরি করতে চাচ্ছে। দেশের প্রধান ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে তরুণ ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের কথোপকথন। আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে রাজি হলাম।

বিচিত্রার শাহাদত ভাইয়ের উপস্থিতিতে কথোপকথন শুরু হলো। মডারেটর হচ্ছেন ঔপন্যাসিক মঈনুল আহসান সাবের। সৈয়দ শামসুল হক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুমায়ূন, বলুন তো আপনার লেখাগুলি সবসময় ফর্মা হিসেবে বের হয় কেন? এরচেয়ে বড়ও হয় না, কমও হয় না। এর কারণটা কী?

আমি তাকিয়ে দেখি শাহাদত ভাই মাথা নাড়ছেন। তাঁর মাথা নাড়া থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তরুণ ঔপন্যাসিক কঠিন প্যাঁচে পড়েছে।

আমি হক ভাইকে বললাম, হক ভাই, আপনি তো সনেট লেখেন। সনেটগুলো ১৪ লাইনে শেষ হতে হয়। আপনি যদি আপনার ভাবনা নির্দিষ্ট ১৪ লাইনে শেষ করতে পারেন আমি কেন আমার ভাবনা ফর্মা হিসেবে শেষ করতে পারব না?

হক ভাই খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। এই উত্তর তিনি আমার কাছ থেকে আশা করেন নি। শাহাদত ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আগের চেয়েও দ্রুত মাথা নাড়ছেন। তাঁর এই মাথা নাড়ার অর্থ— হক ভাই প্যাঁচে পড়েছেন।

লেখালেখির দোহাই, আমি হক ভাইকে প্যাঁচে ফেলতে চাই নি। হক ভাই যে প্যাঁচ তৈরি করেছেন, তার ভেতর থেকে বের হতে চেয়েছি। এই মুহূর্তে আমার হাতে হক ভাইয়ের কিছু উপন্যাস আছে। সবগুলিই ফর্মা হিসেবে এসেছে। কিংবা প্রকাশকরা ফর্মা হিসেবে সাজিয়ে নিয়েছেন।

www.MurchOna.com

নন্দিত নরকে উপন্যাসে ফিরে যাই। হঠাৎ করেই বড় বড় মানুষরা (কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান...) *নন্দিত নরকে* নিয়ে লেখা শুরু করলেন। তাদের অনেকের লেখাই যথেষ্ট হাস্যকর। যেমন শামসুর রাহমান মৈনাক হিসাবে *দৈনিক বাংলা*-য় লিখলেন, 'শুনেছি বইটা ভালো হয়েছে। পড়ে দেখতে হবে।'

আমি এতেই খুশি। এই অবস্থায় বন্ধু আনিস সাবেত উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমাকে এসে বললেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তোমাকে নিয়ে *দেশ* পত্রিকায় লিখেছেন।

বলেন কী?

পত্রিকা সঙ্গে আছে, পড়ে দেখ।

উনি আমার বই কোথায় পেলেন?

সেটা তো জানি না। কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে দিয়েছে।

পত্রিকা ধরে রাখতে পারছি না, হাত কাঁপছে।

সনাতন পাঠক ছদ্মনামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কি সত্যিই *নন্দিত নরকে* বইটি নিয়ে লিখেছেন? কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?

এই ঘটনার অনেক অনেক বছর পর নুহাশ পল্লীর সুইমিংপুলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে দল বেঁধে আমরা নেমেছি। খুব আনন্দ হচ্ছে। হঠাৎ সুনীল বললেন, হুমায়ূন, আপনার প্রথম বইটি নিয়ে অনেক অনেক বছর আগে *দেশ* পত্রিকায় আমি একটা লেখা লিখেছিলাম। লেখাটি কি আপনার চোখে পড়েছিল?

আমি বললাম, কী লিখেছিলেন সেটা কি আপনার মনে আছে?

সুনীল বললেন, অবশ্যই। ঔপন্যাসিকের স্মৃতিশক্তি ভালো থাকতে হয়।

www.MurchOna.com

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান। তাঁর কাছে কলেজে পড়ুয়া তরুণ এক কবি এসেছে। সেই তরুণ কবি সিরাজ স্যারের সামনে বসতে বসতে বলল, সিরাজ ভাই, আপনার অমুক লেখাটা পড়েছি। ভালো হয়েছে, তবে...

সিরাজ স্যার তার উত্তরে বললেন...

কী বললেন, সেটা আর উল্লেখ করলাম না। কারণ তা সিরাজ স্যারের চরিত্রের সঙ্গে যায় না। আমার ধারণা গল্পটা বানানো। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের নিয়ে অনেক বানানো গল্প চালু আছে।

পাঠক কি লক্ষ করছেন যে, আমি কৌতূহল জাগ্রত করে দূরে সরে গেছি। সিরাজ স্যার কী বললেন তা জানার আগ্রহ তৈরি করেছি, আগ্রহ মেটানোর ব্যবস্থা করি নি।

আমি একজন Fiction writer. ফিকশন লেখার একটা ছোট্ট টেকনিক ব্যবহার করলাম। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ যেন থাকে। সে যেন কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে। পাঠকের কিছু কৌতূহল মেটানো হবে। কিছু মেটানো হবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে...' Fiction writing-এ তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বনাশ! আমি দেখি উপদেশমূলক রচনা শুরু করেছি। ফিকশন রাইটিংয়ের নিয়মকানুন শেখানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

ঔপন্যাসিক হবার আগ্রহ নিয়ে অনেকেই আসে আমার কাছে। গভীর আগ্রহে জানতে চায় লেখালেখির নিয়মকানুন। আমি তাদের তেমন কিছুই বলতে পারি না। ক্রিয়েটিভিটি শেখানোর কলাকৌশল এখনো মানুষের আয়ত্তে আসে নি। আমার ধারণা ক্রিয়েটিভিটি শেখানো যায় না। যদি শেখানো যেত তাহলে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় লেখকের নাম হতো রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ছেলে। বাবার কাছ থেকে লেখালেখির সব কৌশল শিখে নেওয়ার সুযোগ তাঁরই সবচেয়ে বেশি ছিল।

www.MurchOna.com

সিরাজুল ইসলাম স্যারকে নিয়ে শুরুতে যে গল্প ফেঁদেছি তার ভেতরে আছে বিশ্বাসযোগ্যতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং হাঁটুর বয়েসি অনেক তরুণ লেখককে আমি নিজে সিরাজ ভাই সিরাজ ভাই করতে শুনেছি।

আসল কথা, ফিকশন রাইটারের ফিকশন বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য একটা ঘটনার এমন বর্ণনা হতে হবে, যেন মনে হয়— এটাই তো হবে।

অবিশ্বাস্য ঘটনার বিশ্বাস্য রূপের প্রথম পরিচয় পেলাম আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন। ঘটনাটা বলি। কলেজ ছুটি হয়েছে। আমি কলেজ থেকে যাচ্ছি নানাবাড়িতে— মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা)। গৌরীপুর জংশনে ট্রেন বদল করতে হয়। পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। সময় কাটানোর জন্য কিছু বই কিনে নিয়ে গেছি। মস্কোর প্রগতি প্রকাশনীর বই। বইগুলো দামে খুব সস্তা। সুন্দর কাগজ, ঝকঝকে ছাপা। একটি গল্প পড়তে শুরু করেছি— গল্পের নাম 'হৈটি টৈটি'। অদ্ভুত নাম দেখে এই গল্পটি প্রথম পড়ার জন্য বাছলাম। লেখকের নাম খুব সম্ভব আলেকজান্ডার বেলায়েভ (খুব সম্ভব বলছি, কারণ চল্লিশ বছর আগের স্মৃতি। ঝাপসা হয়ে আসছে।) গল্পে একটা মানুষের মাথায় হাতির ব্রেইন ট্রান্সপ্লান্ট করে দেয়া হয়। মানুষটি সম্পূর্ণ বদলে যায়, কারণ তার জগৎ হয়ে যায় হাতির জগৎ। তার স্মৃতি হাতির স্মৃতি।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য গল্প। অথচ কী উপস্থাপনা! লেখক যা লিখছেন মনে হচ্ছে সবই সত্যি। কোথাও সামান্য অতিকথন পর্যন্ত নেই। এ ধরনের গল্প তো আগে পড়ি নি। উত্তেজনায় আমার হাত-পা কাঁপা শুরু হলো। গল্প শেষ হবার পর আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম। সায়েন্স ফিকশন নামক নতুন একধরনের রচনা পড়ার সেটাই শুরু। কী অপূর্ব শুরু! গৌরীপুর জংশনের কোলাহল। ট্রেনের আসা-যাওয়া। ট্রেন চলে যাবার পর পর হঠাৎ কিছুক্ষণের নীরবতা। তার মধ্যে আমার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর প্রথম পাঠ।

পড়ার জন্য সায়েন্স ফিকশনের বই খুঁজি। পাই না। এই ধরনের রচনার লেখকের সংখ্যা হাতেগোনা। এসিমভ, লেরি নিভেন, আর্থার সি ক্লার্কের নাম তখনো শুনি নি। একদিন হাতে এল *উভচর মানব* নামের আরেকটি রচনা। কী অদ্ভুত উপন্যাস!

সায়েন্স ফিকশন ঢুকে গেল আমার রক্তে। তার ফলাফল হলো আমার তৃতীয় প্রকাশিত উপন্যাসটি একটি সায়েন্স ফিকশন। নাম *তোমাদের জন্যে ভালোবাসা*। অঙ্কের গ্রান্ডমাস্টার ফিহাকে নিয়ে কাহিনী। ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত *বিজ্ঞান সাময়িকী* সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে আবার ছাপাও হয়েছে। বই আকারে প্রকাশের সময় একটি নির্ঘণ্ট যুক্ত করে দিয়েছি। আমার ভয়

ছিল পাঠকরা নতুন নতুন শব্দ এবং ধারণা ঠিক বুঝতে পারবে না। যেমন—

নিওরোন : মস্তিষ্কের যেসব কোষে স্মৃতি সজ্জিত থাকে।

দ্বৈত অবস্থানবাদ : একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কীয় সূত্র। (কাল্পনিক)

NGC 1303 : দূরবর্তী কোয়াজার। (কাল্পনিক)

সিলঝিন : ১১৯তম ধাতু সিলঝিনিয়াম ও এন্টিনিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরি বিশেষ ঘাতসহ সঙ্কর ধাতু। (কাল্পনিক)

বই প্রকাশের সময় কভার নিয়ে একটা সমস্যা হলো। এ ধরনের বইয়ের কভার কী হবে কেউ বুঝতে পারছে না। শেষে *দৈনিক বাংলা*-র শিল্পী কালাম মাহমুদ (এখন প্রয়াত) একটা কভার করেন— কিছু চক্র, কিছু চতুর্ভুজ দিয়ে এক ধরনের খিচুড়ি। যার সঙ্গে বইয়ের কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই।

তোমাদের জন্যে ভালোবাসা নিয়ে বিতং করে অনেক কিছু লিখলাম। কারণ নানান আলোচনায় দেখছি লেখা হচ্ছে— *তোমাদের জন্যে ভালোবাসা* বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশন। বাংলা ভাষার কথা বলতে পারছি না, তবে বাংলাদেশে এটিই প্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। এই বা কম কী?

আমার ছোটভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল এরপর সায়েন্স ফিকশন লেখায় হাত দেয় এবং চমৎকার কিছু লেখা লেখে। তার বেশির ভাগ সায়েন্স ফিকশন হলো হার্ড কোর জেনারের— অর্থাৎ বিজ্ঞানের সূত্র যেখানে নিখুঁতভাবে মানা হয়। বাংলাদেশের অনেক পাঠকের মতো আমিও আমার ছোটভাইয়ের হার্ড কোর সায়েন্স ফিকশনের ভক্ত।

যেসব পাঠক আমার লেখা সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে পরিচিত না, তাদের জন্য একটি গল্প দিয়ে দিচ্ছি। গল্পটি পূর্বপ্রকাশিত।

অঁহক

ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেসশিপগুলির পরিচালনা নীতিমালায় তিনটি না-সূচক সাবধান বাণী আছে। স্পেসশিপের ক্যাপ্টেনকে এই তিন 'না' মেনে চলতে হবে।

১. স্পেসশিপ কখনো নিউট্রন স্টারের বলয়ের ভেতর দিয়ে যাবে না।

২. ব্ল্যাকহোলের বলয়ের ভেতর দিয়ে যাবে না।

৩. অঁহক গোষ্ঠীর সীমানার কাছাকাছি যাবে না। ভুলক্রমে যদি চলে যায়, অতি দ্রুত বের হয়ে আসবে।

সমস্যা হলো নিউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আগেভাগে টের পাওয়া যায়। সময়মতো ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু অঁহকদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগেভাগে তাদের উপস্থিতি জানার কোনো উপায় নেই।

www.MurchOna.com

অথচ অঁহকরা মহাশূন্যের বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। বিপদগ্রস্ত মহাশূন্যযানের সাহায্যের জন্যে অতি ব্যস্ত। তাদের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। যে-কোনো যন্ত্রাংশ তারা অতি দ্রুত ঠিক করতে পারে। এই অনন্ত মহাবিশ্বের যে-কোনো শ্রেণীর প্রাণীর যে-কোনো ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক করে ফেলতে পারে। তারপরেও এদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এদেরকে ব্ল্যাকহোল কিংবা নিউট্রন স্টারের মতোই বিপদজনক ভাবা হয়।

অঁহকদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোনো তথ্য কোথাও নেই। গ্যালাকটোপিডিয়াতে লেখা আছে—

অঁহক

অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রাণী। ছোট ছোট দলে এরা অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট প্রাণী। এদের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি অজ্ঞাত। ধারণা করা হয় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে এরা প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। অন্যসব বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। তবে বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের সাহায্যে অতিদ্রুত ছুটে আসে। ভগ্ন যন্ত্রাংশ ঠিক করা এবং আহত প্রাণীদের চিকিৎসায় এদের ক্ষমতা সীমাহীন।

অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছাকাছি এলে এরা নিজেদের অদৃশ্য রাখতে পছন্দ করে। এই ক্ষমতা তাদের আছে। তারা টেলিপ্যাথিক মাধ্যমেও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। আহত বুদ্ধিমান প্রাণীদের চিকিৎসা দান কালে তারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে আহতের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয়। তবে নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বলে না।

তাদের যান্ত্রিক কোনো কিছু নেই। কারণ, তাদের যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। মহাকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে তারা ছোটাছুটি করতে পারে।

ধারণা করা হচ্ছে অঁহকরা অতি শান্তিপ্রিয়। সিরাস নক্ষত্রের গ্রহ 'ভি থ্রি'র অতি উন্নত প্রাণী মায়রাদের একটি দল একবার অঁহকদের লক্ষ করে আণবিক ব্লাস্টার, লেজার-নিও ব্লাস্টার এবং পজিট্রন ব্লাস্টার নিক্ষেপ করে। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তৈরি হয়। এর উত্তরে অঁহকরা তাদের যাত্রাপথ থেকে সরে যায় এবং তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তায় বলা হয়— ধ্বংসে আনন্দ নেই। আনন্দ সৃষ্টিতে।

www.MurchOna.com

অঁহকদের মোট সংখ্যা, তাদের জীবনকাল কিংবা বাসস্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। খুব সম্ভব তাদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই। তাদের শরীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া এবং জৈব রসায়ন বিষয়ক কোনো কিছুই জানা যায় নি। স্পেকট্রোগ্রাফিতে প্রাপ্ত সামান্য তথ্যে অনুমান করা হয় তারা মেঘসদৃশ্য প্রাণী। তাদের বলয় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে গামা রশ্মি এবং এক্স রশ্মির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণ অনিয়মিত বলেই তাদের উপস্থিতি আগে থেকে বোঝা যায় না।

গ্যালাকটোপিডিয়াতে অঁহকদের সম্পর্কে খারাপ কিছু নেই। মহাবিশ্বের অন্যসব বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গেই তাদের যুক্ত করা হয়েছে। তবে তাদের স্থান হয়েছে রেড বুকে। রেড বুকে নাম ওঠার অর্থ এদের কাছে যাওয়া অতি বিপদজনক।

স্পেসশিপ 'লি-২০১' একটি সাধারণ ফেরিশিপ। এর কাজ সৌরমন্ডলের ভেতরে গ্রহ এবং উপগ্রহ থেকে খনিজ দ্রব্য মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাওয়া। খনিজ দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সব বড় বড় কলকারখানাই মঙ্গল গ্রহে করা হয়েছে।

স্পেসশিপ লি-২০১-এর মাল বহনের ক্ষমতা অসাধারণ। এর ইঞ্জিন ইলেকট্রন এমিশন ইঞ্জিন। পুরনো ধরনের ইঞ্জিন হলেও ভারি ইঞ্জিন এবং কার্যকর ইঞ্জিন। সাধারণত 0.2C [C আলোর গতিবেগ] গতিতে চলে। প্রয়োজনে এই গতিবেগ বাড়িয়ে 0.6C পর্যন্ত যাওয়া যায়।

লি সিরিজের স্পেসশিপ পরিচালনার জন্যে কোনো মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ এনারবিক রোবট কম্পিউটারের সাহায্যে এই কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে।

তবে লি সিরিজের দু'শ'র ওপরের নাম্বার শিপে অবশ্যই একজন মহাকাশ নাবিক লাগে। কারণ, এই সিরিজ তৈরি করা হয়েছিল মিল্কিওয়ে গ্যালিয়াম ভেতরের মাইনিং-এর জন্যে। ইলেকট্রন এমিশন টেকনোলজি ছাড়াও এই জাতীয় মহাকাশযানে হাইপার স্পেস জাম্পের ব্যবস্থা আছে। দু'শ' সিরিজের এটি দ্বিতীয় মহাশূন্যযান। প্রথমটি লি-২০০ মহাশূন্যে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিধ্বস্ত হবার কোনো কারণ জানা যায় নি। ধারণা করা হয় কোনো বিচিত্র কারণে মহাশূন্যযানটি হাইপার স্পেস জাম্প দেয়। সেট কো-অর্ডিনেট না থাকায় সেটা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়।

এক হাজার টন গ্যালিয়াম ধাতু নিয়ে মহাকাশযান লি-২০১ বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ থেকে মঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে। কনট্রোল প্যানেলে যে বসে আছে তার নাম নিম। বয়স মাত্র ২৭। মেয়েটি তিন মাস আগে মহাকাশযান পরিচালনার

www.MurchOna.com

সার্টিফিকেট পেয়েছে। তবে ট্রেনিং পিরিয়ড এখনো শেষ হয় নি। তাকে এক হাজার ঘণ্টার ফ্লাইং টাইম সংগ্রহ করতে হবে। নিম এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে দু'শ' একুশ ঘণ্টা। আজকের ফ্লাইট শেষ হলে আরো এগারো ঘণ্টা যুক্ত হবে।

নিমের চোখ কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। অটো পাইলট-এ দেয়া আছে। আর মাত্র আটত্রিশ মিনিট এগারো সেকেন্ডে সে পৌঁছে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ডিমোসের পাশে। ফিক্সড অরবিট নিয়ে অপেক্ষা করবে মঙ্গলে অবতরণ অনুমতির জন্যে। সেখানেও কিছু করতে হবে না। সবই অটো পদ্ধতিতে হবে। এই কাজের জন্যে মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানের একজন এনারবিক রোবটই যথেষ্ট। নিমের পাশের আসনে যে রোবটটি বসে আছে সে সাধারণ মানের নয়। যে-কোনো মহাকাশযান সে চালাতে পারে। অতি আধুনিক হাইপার ডাইভার চালনার দক্ষতাও তার আছে। এই এনারোবিক রোবটের নাম দৃস। এরা S2 টাইপ রোবট বলেই তাদেরকে মানুষের মতো আলাদা নাম দিয়ে সম্মান দেখানো হয়।

দৃস নিমের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বলল, মিস ক্যাপ্টেন, আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি ?

নিম বলল, নিশ্চয়ই পার।

দৃস বলল, আপনি কি কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন ?

অস্বাভাবিকতাটা কী ধরনের ?

আমাদের এই মহাকাশযানের গতি 0.2C থাকার কথা। প্রোগ্রাম সেরকমই করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় না গতি বাড়ছে ?

নিম বিরক্ত গলায় বলল, সেরকম মনে হয় না। পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখ গতি দেখানো আছে।

দৃস বলল, আপনি কি দয়া করে ভিউ ফাইন্ডারের দিকে তাকাবেন। যে-কোনো দুটি উজ্জ্বল তারার দিকে তাকালেই লক্ষ করবেন আমাদের মহাকাশযানের গতি 0.4C-র কাছাকাছি।

এটা হতেই পারে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা হতে পারে না। কিন্তু ফুয়েল কনজামশান রেটের দিকে তাকাল আপনি দেখবেন আমি যা বলছি তা ঠিক।

নিম অতিদ্রুত কয়েকটি রিডিং নিল। রিডিং থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ফুয়েল কনজামশান রিডিং 0.4C গতিবেগের কথাই বলে। কিন্তু এই গতিবেগে কনট্রোল প্যানেলে লালবাতি জ্বলবে। হাইপার ডাইভ প্রক্রিয়া কার্যকর হবে।

দৃস বলল, ম্যাডাম, আপনি ভীত হবেন না।

www.MurchOna.com

নিম বলল, আমি ভীত তোমাকে কে বলল ?

দৃস বলল, মহাকাশযানের গতি এখন 0.5C। ভীত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভীত না হবার জন্য বলছি।

নিম মঙ্গলের স্পেসশিপ মনিটারিং সেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। যোগাযোগ করা গেল না। দৃস বলল, ম্যাডাম, কোনো মহাকাশযানের গতিবেগ যদি 0.5C-র চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

এই তথ্য আমি জানি।

আপনি যদি জানেন তাহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন কেন ?

তুমি আমাকে কী করতে বলছ ?

আমি আপনাকে ভীত না হবার জন্যে বলছি।

একটু আগেই তুমি বলেছ ভীত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

দৃস বলল, আমার ধারণা যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে সমস্যা আপনার ট্রেনিং এর অংশ।

নিম বলল, তার মানে কী ?

ট্রেইনী নাবিকদের জন্যে মাঝে মাঝে পরিকল্পিতভাবে সমস্যা তৈরি করা হয়। দেখার জন্যে এরা সমস্যার সমাধান কীভাবে করে।

তোমার এরকম মনে হচ্ছে ?

আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাটি ট্রেনিং এর অংশ, তার সম্ভাবনা কত ?

0.30।

বলো কী! এত কম সম্ভাবনা ?

ত্রিশ পারসেন্ট সম্ভাবনা কম না, মিস ক্যাপ্টেন।

৭০ পারসেন্ট সম্ভাবনা যে এটা বাস্তব সমস্যা ?

আপনি যথার্থ বলেছেন। মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়েই চলেছে। ট্রেনিং এর সময়েও গতিবেগ এত বাড়ানো হয় না। তাছাড়া এটা মাল বোঝাই ফেরিশিপ।

এখন করণীয় কী ?

আপনি খুব ভালো করেই জানেন এখন করণীয়।

তারপরেও তুমি আমাকে সাহায্য কর।

আপনি যদি কূলকিনারা না পান তাহলে ইমার্জেন্সি ব্লু বাটন টিপবেন। ইমার্জেন্সি বাটন টেপার পর আপনার কিছুই করার থাকবে না। কম্পিউটার

www.MurchOna.com

সিডিসি আপনার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ছোট্ট সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে মিস ক্যাপ্টেন।

সমস্যা কী?

যেসব ট্রেইনী নাবিক ব্লু বাটন টেপে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। তারা আর কখনো আকাশে উড়তে পারবে না।

আমার কী করা উচিত?

আপনার ইমার্জেন্সি বাটন টেপা উচিত।

নিম ইমার্জেন্সি বাটনে চাপ দিল। প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কম্পিউটার সিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল।

কম্পিউটার সিডিসি বলছি। আমি মহাকাশযানের কম্পিউটারের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আমরা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগুচ্ছি। অতি দ্রুত ত্বরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। সেটা করা যাচ্ছে না। আয়ন ইঞ্জিনের যে ত্রুটি ধরতে পেরেছি সেই ত্রুটি সারানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

নিম বলল, ত্রুটি কেন দেখা গেল?

এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে সময় নেই।

তুমি এখন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। খুব অল্পসময়েই এই মহাকাশযান বিধ্বস্ত হবে। কারণ, এটি একটি মাল বোঝাই কার্গো। 0.6C-র গতিবেগ এ নিতে পারবে না।

আমাদের হাতে কত সময় আছে?

তিন মিনিটেরও কম।

আমার কি কিছু করণীয় আছে?

না। আপনি পেন্টাথেল থ্রি ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। মৃত্যু হবে ঘুমের মধ্যে।

নিম ঠান্ডা গলায় বলল, অতি সুন্দর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।

নিমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হলো। ভয়াবহ বিস্ফোরণ।

অঁহকদের ছোট্ট একটা দল দ্রুত কাজ করছে। তাদের কাজ যিনি তদারক করছেন তাকে তারা 'মহান শিক্ষক' নামে ডাকছে। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তারা মহান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে। এমনও হচ্ছে একসঙ্গে সবাই কথা বলছে। মহান শিক্ষক একই সঙ্গে সবার কথার জবাব দিচ্ছেন।

www.MurchOna.com

মহান শিক্ষক বললেন, তোমরা কি আনন্দ পাচ্ছ?

একসঙ্গে সবাই বলল, আমরা খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

আমরা কেন বেঁচে আছি?

আনন্দের জন্যে বেঁচে আছি।

আমরা কেন বেঁচে থাকব?

আনন্দের জন্যে বেঁচে থাকব।

মৃত্যু কী?

আনন্দের সমাপ্তি।

তোমরা যে মেয়েটির শরীরবৃত্তিয় ক্ষতি ঠিকঠাক করছ সে কোন সম্প্রদায়ের, তা কি জানো?

জানি মহান শিক্ষক। সে মানব সম্প্রদায়ের।

মানব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কী?

বৈশিষ্ট্যহীন একটি সম্প্রদায়। যাদের শরীরবৃত্তিয় কর্মকাণ্ড অতি দুর্বল।

দুর্বল বলছ কেন?

এরা অক্সিজেননির্ভর একটি প্রাণী। অক্সিজেন একটি ভারি গ্যাস। ভারি গ্যাস নির্ভর প্রাণী দুর্বল হয়। হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম-নির্ভর প্রাণীরা সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিমান। যেমন আমরা হাইড্রোজেন-নির্ভর।

এর বাইরে কী আছে?

এরা অতি নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিহীন প্রাণীদের মতোই খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই তারা চিন্তা বা শিক্ষার সময় পায় না। তারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য পরিপাক এবং খাদ্য বর্জনে।

ভালো বলেছ। এদের আর কী ত্রুটি আছে?

এদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এরা আমাদের মতো যন্ত্রমুক্ত না। মহান শিক্ষক, আপনি বলেছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা নিম্নমানের সভ্যতা।

যে-কোনো বস্তুর ওপর নির্ভর সভ্যতাই নিম্নমানের সভ্যতা। এই সত্যটি সব সময় মনে রাখবে।

মহান শিক্ষক, আমরা মনে রাখব।

তোমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বলো।

মেয়েটি যে যন্ত্রযানে করে এসেছে সেটি সম্পূর্ণ ঠিক করা হয়েছে। যন্ত্রযানের মূল ডিজাইনে একটি ত্রুটি ছিল। আমরা সেই ত্রুটিও ঠিক করে দিয়েছি।

কাজটা করে কি আনন্দ পেয়েছ ?

মহান শিক্ষক, খুবই আনন্দ পেয়েছি।

মেয়েটির অবস্থা কী ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মেয়েটির শরীরের যে অংশ অক্সিজেনবাহী তরল পরিশুদ্ধ করে সেই অংশই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সামান্য বেশি সময় আমরা নিয়েছি। তার জন্যে আমরা দুঃখিত মহান শিক্ষক।

কাজটা করে কি তোমরা আনন্দ পেয়েছ ?

আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। এখন আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

কী নির্দেশ ?

মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পাবার পর যেন অত্যন্ত আনন্দ পায় তার জন্যে কিছু কি করব ? তার শরীরের কিছু পরিবর্তন ? তার জন্যে মঙ্গলময় হয় এমন কিছু পরিবর্তন ?

অবশ্যই করবে। আমরা উপকারী সম্প্রদায়। আমাদের কাজ দুর্বল সম্প্রদায়ের উপকার করা। তাদের ত্রুটি দূর করা। অতি দুর্বল বুদ্ধিমত্তার প্রাণীরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারে না। মেয়েটির কোন কোন ত্রুটি সারাবার কথা ভাবছ ?

সে মহাকাশযান চালক। মাত্র দুটি হাতে এই জটিল মহাকাশযানের সমস্ত বোতাম এবং চক্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমরা তাকে আরো বাড়তি দুটি হাত দিতে চাচ্ছি।

অতি উত্তম প্রস্তাব। দাও।

হাতের আঙুলের সংখ্যা পাঁচটির জায়গায় দশটি করে করতে চাচ্ছি।

এটিও ভালো প্রস্তাব। করে দাও।

মানব সম্প্রদায়ের পেছনে কোনো চোখ নেই। পেছনে চোখ না থাকার কারণে সে পেছনে দেখতে পারে না। পেছনে দেখার জন্যে তাকে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হয়। আমরা ভাবছি তার পেছনে একটি চোখ দিয়ে দেব।

জায়গাটা ঠিক করেছ ?

ঘাড়ে দিতে চাচ্ছি।

দাও, ঘাড়েই দাও। তবে ঘাড়ে একটি চোখ না দিয়ে দুটি চোখ দাও। মানব সম্প্রদায় সবসময় দুটি চোখ ব্যবহার করে এসেছে। সেখানে হঠাৎ করে পেছনে একটা চোখ তার পছন্দ নাও হতে পারে।

ঠিক আছে মহান শিক্ষক, আমরা পেছনেও দুটি চোখ দিয়ে দেব।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আর কিছু কি ভাবছ ?

আপনার অনুমতি পেলে আরেকটি ছোট্ট পরিবর্তন করা যায়।

বলো কী পরিবর্তন ?

মানব সম্প্রদায়ের গায়ের চামড়া সবচেয়ে দুর্বল। আমরা কি একটি ধাতব আবরণ দিয়ে দেব ?

না। তার প্রয়োজন দেখি না। চামড়া দুর্বল হলেও সে স্পেস স্যুট পরে। এটি যথেষ্ট মজবুত। গায়ের চামড়া ছাড়া বাকি পরিবর্তনগুলি করে দাও।

মহান শিক্ষক।

বলো।

মেয়েটি যখন তার শরীরের পরিবর্তনগুলি দেখবে তখন সে খুবই আনন্দ পাবে।

অবশ্যই আনন্দ পাবে।

মেয়েটির আনন্দের কথা ভেবেই আমাদের আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ মানেই বেঁচে থাকা। আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের সবার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

ধন্যবাদ মহান শিক্ষক।

নিমের মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। সে হতভম্ব হয়ে তার চারটি হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দৃস।

নিম চোখ তুলে ছায়ার দিকে তাকাল।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন, আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ভয়ঙ্কর অঁহকদের হাতে পড়েছিলাম।

নিমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে এখনো জানে না তার ঘাড়েও দুটি চোখ আছে। সেই চোখ দিয়েও পানি পড়ছে।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন, কাঁদবেন না। আপনার জন্যে একটি ভালো সংবাদ আছে।

নিম ফোপাতে ফোপাতে বলল, ভালো সংবাদটি কী ?

দৃস বলল, আপনার ঘাড়ে যে দুটি চোখ আছে, সেই চোখ দুটি আসল চোখের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর।

www.MurchOna.com

যে-কোনোদিন M.Sc. থিসিস গ্রুপের রেজাল্ট বের হবে। টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করছি। ফার্স্টক্লাস যে পাব এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। পজিশন কী হবে এই নিয়ে সন্দেহ। পজিশনে যদি নিচে নেমে যাই, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারির সুযোগ নাও পেতে পারি। ভাইভা খুব সুবিধার হয় নি। প্রফেসর আলি নওয়াব Zeta potential বিষয়ে একটা জটিল প্রশ্ন করে আমাকে আটকে দিয়েছিলেন। গভীর গর্তে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মতো। একশ' নাম্বারের ভাইভা। এখানে নাম্বার কমে গেলে দ্রুত পজিশন নামবে।

রেজাল্টের খোঁজে রোজ কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে ঘোরাঘুরি করি। পয়সাওলা বন্ধুবান্ধব খুঁজি যে আমাকে চা-শিঙ্গাড়া খাওয়াবে। অর্থনৈতিকভাবে আমি তখন পঙ্গুরও নিচে। বাবা মরে যাবার কারণে মা ১৮৫ টাকার মাসিক পেনশন পান, এটাই ভরসা। তিনি এবং তাঁর ছোটভাই রুহুল আমিন শেখ (পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান, মংলাপোর্ট/সফল একজন ভালো মানুষ) অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা থেকে টাকাপয়সা ধার করে আনেন। তাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার চলে। আমি সারাক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখি। একটা চাকরি আমার ভীষণ দরকার। আগে তো রেজাল্ট হবে, তারপর চাকরি।

কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গেছি, বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি। চেয়ারম্যান স্যারের পিয়ন এসে বলল, স্যার আপনারে ডাকে। আমার কলজে শুকিয়ে গেল। খোন্দকার মোকাররম হোসেন কোনো ছাত্রকে ডাকবেন আর তার কলিজা শুকিয়ে শুঁটকি হয়ে যাবে না, তা হয় না। স্যার ভুল করেন নি তো ? আমাকে কি তিনি নামে চেনেন ? চেনার কথা না।

ভয়ে ভয়ে স্যারের ঘরে ঢুকলাম। স্যার কী যেন লিখছেন। আমি নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আছি। নিঃশ্বাসের শব্দে স্যারের লেখায় যেন বিঘ্ন না ঘটে।

স্যারের লেখা শেষ হলো। তিনি লেখাটা খামে ঢুকালেন। খামের মুখ বন্ধ করলেন। এবং খামটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি খাম হাতে নিলাম।

স্যার বললেন, তুমি ময়মনসিংহ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে চলে যাও। চেয়ারম্যান কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে এই চিঠি দেবে। তুমি লেকচারারের একটা

www.MurchOna.com

চাকরি পেয়ে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পোস্ট খালি নেই। পোস্ট খালি থাকলে এখানেই তোমাকে নিতাম। এখন সামনে থেকে যাও, আমাকে কাজ করতে দাও।

আমি দ্রুত স্যারের ঘর থেকে বের হলাম। তখন মনে হলো, সর্বনাশ! স্যারকে তো ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। আমি আবার ঢুকলাম। স্যার বিরক্ত গলায় বললেন, আবার কী ? আমি বললাম, স্যার, আপনাকে সালাম করব।

স্যার রিভলভিং চেয়ারে বসে ছিলেন। তিনি চেয়ার ঘুরালেন। পা থেকে জুতা খুললেন। মোজা খুললেন। সালাম নেবার জন্য অনেক আয়োজন করলেন। আমি পা ছুঁয়ে কদমবুসি করতেই তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, May God be always with you.

আজ আমার বয়স ষাট। অনেকেই নানান কারণে আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে আসে। আমি আয়োজন করেই সালাম গ্রহণ করি এবং মোকাররম স্যারের মতো বলি, May God be always with you.

কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মোকাররম স্যারের চিঠি পড়ে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার M.Sc. রেজাল্ট তো হয় নাই।

আমি বললাম, জি-না স্যার।

মোকাররম স্যারের চিঠি আছে। এই চিঠিই যথেষ্ট। সমস্যা একটাই, আপনাকে চাকরি দেব। দু'দিন পরে আপনি চলে যাবেন। আবার আমাদের নতুন টিচার খুঁজতে হবে।

চলে যাব ভাবছেন কেন ?

চলে যাবেন ভাবছি কারণ আপনার রেজাল্ট ভালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেই আপনি চলে যাবেন। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আপনার মতো মানুষদের transit point.

আমি হতাশ গলায় বললাম, আমার চাকরি কি স্যার হচ্ছে না ?

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, মোকাররম স্যার চিঠি দিয়েছেন। আপনাকে চাকরি না দিয়ে উপায় আছে ? আমি সুপারিশ করছি যেন আপনাকে অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয়। যাতে বেতনের লোভে হলেও আপনি এখানে থেকে যান।

সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারারের বেসিক পে ছিল ৪৫০ টাকা। অনার্স এবং এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস থাকলে দু'টা ৫০ টাকার ইনক্রিমেন্ট পেয়ে হতো ৫৫০ টাকা। আমাকে চারটা ইনক্রিমেন্ট দেয়া হলো। বেতন হলো ৬৫০ টাকা। সেই সময়ের জন্যে অনেক টাকা।

www.MurchOna.com

আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু হলো। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, বিশাল ব্যাপার। কিন্তু সেখানের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট হলো দিঘিতে শিশির বিন্দু। সেখানে কেমিস্ট্রি পড়ানো হয় সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসাবে। ল্যাবরেটরির অবস্থা তথৈবচ। কেমিস্ট্রির শিক্ষকরা ক্লাসে যান নিতান্তই অনাগ্রহে। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র শিক্ষকরা (কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি) যে যার বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন কিংবা তাস খেলেন। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করি। সকাল দশটায় রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষকের মেটালার্জি (ধাতুবিদ্যা) বিষয়ে ক্লাস। ক্লাস শুরু হবার পাঁচ মিনিট আগে ওই শিক্ষক আমাকে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, আমার ক্লাসটা নিয়ে আসুন তো। আমার আজ ক্লাস নিতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, ভাই, মেটালার্জি আমার বিষয় না। আমি ভৌত রসায়নের। ওই ক্লাস আমি কীভাবে নেব ? আমার তো কোনোরকম প্রিপারেশন নেই।

প্রিপারেশন লাগবে না। ক্লাসে ঢুকে যান। কিছুক্ষণ বকবক করে চলে আসবেন।

আপনি পড়াচ্ছেন কী ?

স্টিল। স্টিল কীভাবে তৈরি হয়, এইসব হাবিজাবি।

আমি ক্লাসে ঢুকলাম। মন খারাপ করেই ঢুকলাম। হচ্ছেটা কী ?

এখন বলি কীভাবে থাকতাম। কয়েকজন শিক্ষক মিলে ইউনিভার্সিটির কাছেই একটা পাকাবাড়ি ভাড়া করেছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। আমাকে আলাদা একটা রুম দেওয়া হলো। সকালবেলা একটা কাজের মেয়ে আসে। মেয়েটা অল্পবয়স্ক। বেশির ভাগ শিক্ষকই মেয়েটার সঙ্গে রসিকতা করা দায়িত্ব মনে করেন। এই মেয়ে ঘর ঝাঁট দেয়। বাজার করে আনে। রান্না করে। দুপুরে সবাইকে খাইয়ে থালাবাসন পরিষ্কার করে চলে যায়। খাবার যা বাঁচে রাতে তাই খাওয়া হয়। নতুন করে রান্না হয় না। খাবারের আয়োজন থাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের। শিক্ষকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেন টাকা বাঁচানোর।

বিনোদনের ব্যবস্থার কথা বলি। দুই প্যাকেট তাস আছে। তাস দিয়ে ব্রিজ খেলা হয়। মাঝে মাঝে লুডু খেলা হয়। সব খেলাই সিরিয়াসলি খেলা হয় না। লুডু খেলায় গুঁটি খাওয়া নিয়ে কয়েকবার হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে।

আমি কিছুতেই তাদের সঙ্গে মিশ খাওয়াতে পারি না। শিক্ষকদের মধ্যে একজনকে আমার পুরোপুরি মানসিক রোগী বলে মনে হলো। তিনি রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আমার কাছে এসে বিনীত গলায় বলেন, আমাকে একটা লাথি দেবেন ? কষে আমার পাছায় একটা লাথি।

www.MurchOna.com

প্রথম রাতে এই কথা শুনে আমি চমকে উঠে বললাম, লাথি দেব কেন ?

ভদ্রলোক আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললেন, আপনি পবিত্র একজন মানুষ। আপনি লাথি দিলে আমার কিছু পাপ কাটা যাবে। আমি ভয়ঙ্কর পাপী একজন মানুষ। কী কী পাপ করেছি শুনবেন ?

না।

না বলার পরেও তিনি পাপের কথা বলতে থাকেন। আমার বমি আসার মতো হয়। কাজের মেয়েটির রান্না গলা দিয়ে নামতে চায় না।

গ্লানিময় পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে আমি ময়মনসিংহ শহরে যাই। শহরের ছোটবাজার নামক জায়গায় আমার মেজোখালা থাকেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু তাঁর বাড়িটিও বিচিত্র। তাঁর ছোট ছেলেমেয়েগুলি কোনো কারণ ছাড়াই সারাদিন তারস্বরে কাঁদে। এই কান্না বিরামহীন। খালা এসে মাঝে মাঝে কান্না থামাবার জন্য এদের পিঠে ধুম ধুম কিল দেন। এতে তাদের ব্যাটারি রিচার্জ হয়। তারা নবোদ্যমে কান্না শুরু করে।

বায়োলজিক্যাল ইভোলিউশনের নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চাদের কান্না এমন হয়, যা বড়দের মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তি তৈরি করবে। যাতে বড়রা ছুটে এসে কান্নার কারণ অনুসন্ধান করে। বাচ্চাদের কান্না যদি বিরক্তি উৎপাদন না করে, তাহলে কেউ কান্নার কারণ অনুসন্ধানে এগিয়ে আসবে না। শিশু থাকবে একা। ইভোলিউশন বাধাগ্রস্ত হবে।

খালার বাসায় যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ ইভোলিউশনের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করি। বেশির ভাগ সময় আমি চলে যাই দোতলার একটা ঘরে। দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি, যাতে আওয়াজটা কম আসে।

ছুটির দিনের এক দুপুরের কথা। দোতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। একটা জানালা শুধু খোলা। বৃষ্টি দেখার জন্য সেই জানালাটা খোলা রেখেছি। ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আরামে চোখে ঘুম এসে যাচ্ছে। খালার বাচ্চাগুলোর কান্নাটাও আবহসঙ্গীতের মতো লাগছে। ঘুম ঘুম অবস্থায় (কিংবা ঘুমের মধ্যে) একটা ঘটনা ঘটল। আমি স্পষ্ট দেখলাম জানালার শিক গলে অদ্ভুত এক প্রাণী ঢুকল। পাঁচ ফুটের মতো লম্বা। লোমশ শরীর। মুখমণ্ডল মানুষের মতো। প্রাণীটা ইশারায় কাদের যেন ডাকল। তারা ঘরে ঢুকল। এরা সাইজে খুবই ছোট। মনে হয় বড়টার সন্তান। বড়টা এসে আমার বুকে বসল। দুহাত দিয়ে গলা চেপে ধরল। মেরে ফেলার চেষ্টা। আমি হাত-পা কিছুই নাড়াতে পারছি না। চিৎকার করার চেষ্টা করছি। পারছি না। নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে শুরু করেছি।

www.MurchOna.com

পরে শুনলাম এটা একটা অসুখ। অসুখের নাম বোবায় ধরা। ময়মনসিংহের মেজোখালার বাসায় যে অসুখের শুরু সেই অসুখ আমি এখনো লালন করছি। এখনো আমি একা ঘুমাই না। একা ঘুমালেই বড় বোবাটা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হয়। যখন কেউ আমার সঙ্গে থাকে, তখনো উপস্থিত হয়। তবে তখন আমার গোঙানির শব্দে পাশের জনের ঘুম ভাঙে। সে আমাকে ডেকে তোলে। যে দায়িত্ব এখন বর্তেছে শাওনের কাঁধে।

বোবার হাতে আক্রান্ত হবার পর মেজোখালার বাসায় যাওয়া আমি একেবারেই কমিয়ে দিলাম। খালার বাড়িতে যাওয়ার ভৌতিক কারণ ছাড়াও একটা লৌকিক কারণও ছিল। লৌকিক কারণটা ব্যাখ্যা করি।

খালার ধারণা হলো, বিয়ের পাত্র হিসাবে আমি অতি উত্তম। তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের মেয়েদের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তাঁর বাসায় মফস্বলের আধুনিকতায় আধুনিক তরুণীরা আসা-যাওয়া করতে লাগল। মফস্বলের আধুনিকতা হচ্ছে সারা শরীর দুলিয়ে কথা বলা, অকারণে হাসা এবং অকারণে লম্বা গলায় বলা 'সরি'। তখনো 'Oh Shit' বলা চালু হয় নি।

খালা এদের বলতেন, আমি রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। আমার ভাইগ্না একা বসে আছে। যাও তার সঙ্গে গল্প কর।

তাদের গল্পের নমুনা দেই। একজন গল্প করতে এল। অকারণে হেসে ভেঙে পড়তে পড়তে বলল, আপনি নাকি রাইটার?

হুঁ।

আমি কিন্তু বাংলাদেশের কোনো রাইটারের বই পড়ি না। সরি।

সরি হবার কিছু নেই।

আরেকটা কথা আপনাকে বলি— টিচার আমার দুই চোখের বিষ। আপনি রাগ করলেন নাকি? সরি।

সুপাত্র হিসেবে ইউনিভার্সিটিতে আমার সমস্যা শুরু হলো। কোনো এক ফ্যাকাল্টি ডিন এসে বললেন, আমার মেয়ে দিলরুবা (নকল নাম দিলাম) আপনার ছাত্রী। সে আপনার খুব প্রশংসা করে। আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসবেন। আমাদের সঙ্গে খাবেন। মেস করে থাকেন। কী খান তার নাই ঠিক। আমার স্ত্রী নাটোরের মেয়ে। রান্নার হাত অসাধারণ। বাসা চিনবেন? না-কি দিলরুবাকে পাঠিয়ে দেব আপনাকে নিয়ে যেতে?

বাসা চিনব।

www.MurchOna.com

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে চলে আসবেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দিলরুবা ভালো গান জানে। গান শুনবেন। গানবাজনার প্রতি কি আগ্রহ আছে ? শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকলে হয় না, জীবনে সুকুমার কলারও প্রয়োজন আছে।

সুকুমার কলার সন্ধানে গেলাম। দিলরুবা হারমোনিয়াম নিয়ে তৈরি। তার গানের টিচার এসেছেন। তিনি তবলা বাজাবেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু হলো— 'খোল খোল দ্বার রাখিও না আর...।' তারপর নজরুল— 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী'।

দিলরুবার বাবা বললেন, হুমায়ূন সাহেব, এইবার আপনার পছন্দের গান হবে। বলুন আপনার কোন গান পছন্দ ?

দিলরুবা বলল, আমার কোনো গানই স্যারের পছন্দ হচ্ছে না। আমি লক্ষ করেছি, আমি গান গাওয়ার সময় স্যার অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি আর গানই করব না। বলতে বলতে দিলরুবার গলা ভারি হয়ে গেল। সে বসার ঘর থেকে ছুটে ভেতরের দিকে চলে গেল। দিলরুবার মা বললেন, আমার মেয়ে বড়ই অভিমানী। এখন বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কাঁদবে। বাবা, তোমার কি খিদে লেগেছে ? টেবিলে খাবার লাগাতে বলি ?

বলুন।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। দিলরুবা আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলল, স্যার, একটা আইটেম আমি রান্না করেছি। বলুন তো কোনটা ?

আমি বললাম, এটা বলা তো খুব কঠিন।

দিলরুবা বলল, মোটেই কঠিন না। সবচেয়ে পচা হয়েছে যে আইটেমটা সেটা আমি রেঁধেছি।

আমি বললাম, তাহলে তো মনে হয় সবই তোমার রান্না।

দিলরুবা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আবারো ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনে হয় বাথরুমে ঢুকে কাঁদবে।

তিন মাস পার করার পর চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। চেয়ারম্যান স্যার থমথমে গলায় বললেন, কেন চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ? এখানে সমস্যা কী হচ্ছে ?

আমি বললাম, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পোস্ট খালি হয়েছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করব।

চেয়ারম্যান স্যার হতাশ গলায় বললেন, আমি বলেছিলাম না, এটা হচ্ছে আপনার মতো ছেলেদের ট্রানজিট পয়েন্ট।

জি আপনি বলেছিলেন।

www.MurchOna.com

সেকেন্ড থট দিন। আমি চেষ্টা করব যেন অতি দ্রুত আমাদের ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি করতে যেতে পারেন।

স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন। ময়মনসিংহ আমার শহর। কিন্তু আমাকে শহর টানছে না।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করলাম। ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কোনো অর্জন নেই। সবই বিসর্জন। ছোট্ট একটা অর্জন আছে— এক বর্ষার রাতে 'সৌরভ' নামে একটা ছোটগল্প লিখেছিলাম। গল্পটা *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। সৌরভ আমার লেখা প্রথম ছোটগল্প, যা হারিয়ে যায় নি। ছফা ভাইয়ের পত্রিকায় ছাপা হওয়া গল্পটার এখন কোনো অস্তিত্ব নেই।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য গল্পটা দিয়ে দিলাম। গল্পের পটভূমি ময়মনসিংহ শহর, এটা কি বোঝা যায়?

সৌরভ

আজহার খাঁ ঘর থেকে বেরুবেন, শার্ট গায়ে দিয়েছেন, তখনি লিলি বলল, বাবা আজ কিন্তু মনে করে আনবে।

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেও ধমক দিতে পারেন না। সেই জন্যেই রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

লিলি বলল, রোজ রোজ মনে করিয়ে দেই। আজ আনবে কিন্তু।

সামনের মাসে আনব।

না, আজই আনবে।

রাগে মুখ তেতো হয়ে গেল আজহার খাঁর। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না, আজই আনতে হবে।

তিনি নিঃশব্দে শার্ট গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। জুতা পরলেন। জুতার ফিতায় কাদা লেগেছিল, ঘষে ঘষে সাফ করলেন। লিলি সারাক্ষণই বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই বলল, বাবা, আনবে তো?

মেয়েটার গালে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি শান্ত গলায় বললেন, টাকা নেই, সামনের মাসে আনব।

লিলি নিঃশব্দে উঠে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না সবাই বৈরি হয়ে উঠলে কী করে বেঁচে থাকা যায়। তিনি তো কিছু বলেন নি। শুধু শান্ত গলায় বলেছেন, হাতে টাকা নেই। এটা তাঁকে বলতে হলো কেন? যে মেয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অভাব বুঝতে পারে না সে কেমন মেয়ে?

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অল্পতেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়, সামান্য সব কারণে হতাশ বোধ করেন। বেঁচে থাকা অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

'হতাশা গুণনাশিনী। হতাশা মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে দেয়। তবুও তো ভালোবাসার মতো মহত্তম সৎগুণটি আমার এখনো নষ্ট হয় নি। তোমাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। তোমাদের জন্যে সারাক্ষণ আমার বুক টনটন করে, আর লিলি তুমি তোমার বাবার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাক। মাসের ছাব্বিশ তারিখে তোমার একটি শখের জিনিস আমি কিনে আনতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমারই মেয়ে। তুমি তোমার মায়ের মতো অবুঝ হবে কেন?'

আজহার খাঁর কান্না পেতে লাগল। যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাঁকে এক্ষুনি বাইরে বেরুতে হবে। তবু তিনি চৌকিতে বসে বাইরের আকাশ দেখতে লাগলেন।

বাবা, এই নাও টাকা।

লিলি তিনটি দশ টাকার নোট টেবিলে বিছিয়ে দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, টাকা কোথায় পেয়েছিস?

আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। আনবে তো বাবা?

আনব।

নাম মনে আছে তোমার?

আছে।

লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে ঝিরঝির করে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যা এখনো মিলায় নি। এর মধ্যেই চারদিকের তরল অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। পরিচিত পথঘাটও অপরিচিত লাগছে।

'দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রোজ একই রাস্তায় হাঁটছি। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাই নি। তোমাদের কথা ভেবেই প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দু'টি করে বিস্কিট খায় আমি সেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কী দিয়েছ আমাকে? আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে লিলি, তুমি তোমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখে।'

তাঁর মনে হলো তিনি কুকুরের জীবনযাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

www.MurchOna.com

বৃষ্টির ছাটে আধভেজা হয়ে আজহার খাঁ বাজারে ঢুকলেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাজার তেমন জমে নি। সন্ধ্যাবেলা যেমন জমজমাট থাকে চারদিক সেরকম নয়। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তিনি বড়সড় দেখে একটি স্টেশনারি দোকানে ঢুকে পড়লেন।

'ইভিনিং ইন প্যারিস' সেন্টটা আছে আপনাদের ?

না, অন্য সেন্ট আছে। দেখবেন ?

উঁহু, এইটাই চাই।

তখন ঝমঝম করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। তিন-চারটি দোকান ঘুরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তাঁর গাল বেয়ে পানির স্রোত বইতে লাগল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সেন্টের শিশিটি তাঁর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। বৃষ্টি কখন ধরবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছেন না— এমনি তাড়া। পঞ্চম দোকানে সেটি পাওয়া গেল। দোকানি শিশিটি কাগজে মুড়ে বলল, ইশ, একেবারে যে ভিজে গেছেন ? রিকশা করে চলে যান।

কত দাম ?

ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দরদাম করবার ধৈর্য নেই আর। টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে দু'টি এক টাকার নোট আর একটি আধুলী ছাড়া কিছুই নেই।

দোকানি নীরবে শিশিটি আগের জায়গায় রেখে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এরকম ঘটনা যেন প্রতিদিন ঘটে। কাস্টমার জিনিস কিনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে পয়সা নেই। এ যেন খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আজহার খাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেলেন। হু-হু করে হাওয়া বইছে। ঝড় উঠবে কিনা কে জানে। চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা জমে চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। আজহার খাঁ নীরবে হেঁটে চলেছেন। দু'একটি রিকশা তার ঘাড়ের ওপর পড়তে পড়তে সামলে উঠছে। দ্রুতগামী ট্যাক্সির উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে তাঁর চোখ ঝলকে দিচ্ছে। তিনি আচ্ছন্নের মতো হাঁটছেন। এই বৃষ্টি, এই শীতল হাওয়া, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ময়লা পানির স্রোত, কিছুই যেন নজরে আসছে না তাঁর।

'আহা, আমার মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে হয়তো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার। বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে। তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।'

www.MurchOna.com

এই জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি নয়াপাড়া ছাড়িয়ে হাইস্কুল ছাড়িয়ে সেইজখালী পর্যন্ত চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কী জন্য যাচ্ছেন, এসব তাঁর মনে রইল না। একসময় ইটে ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর পা টলছে; মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। 'পাগলের মতো ঘুরছি কী জন্যে ?' এই ভেবে ফিরে চললেন উল্টো পথে। বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে পোস্ট অফিসের কাছে আসতেই সশব্দে বাজ পড়ল কোথাও। রাত কত হয়েছে কে জানে। বাতি-টাতি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। লোকজন শুয়ে পড়েছে। আজহার খাঁর হঠাৎ মনে হলো রফিকের বাসায় গিয়ে বিশটা টাকা নিয়ে এলে হয়। কিন্তু দোকান খোলা থাকবে কতক্ষণ! তিনি ডানদিকের গলিতে ভেজা স্যান্ডেল টানতে টানতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘন অন্ধকার রাস্তা, বিজলির আলোয় একআধবার সব ফর্সা হয়ে ওঠে। পরক্ষণে নিকষ কালো।

রফিকের বাসায় কড়া নাড়তে গিয়ে বুঝলেন তাঁর শরীর সুস্থ নয়। প্রবল জ্বর এসেছে। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। রফিক আঁতকে উঠে বলল, কী হয়েছে আজহার ভাই ?

না, কিছু হয় নি। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।

বাসার সবাই ভালো আছে তো ? ভাবির জ্বর কেমন ?

সব ভালোই আছে, এক গ্লাস পানি আন আগে।

আজহার খাঁ উদ্‌ভ্রান্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। রফিক তাঁর হাত ধরল, এহ্, তোমার ভীষণ জ্বর। কী হয়েছে বলো ?

টাকা আছে তোমার কাছে ?

কত টাকা ?

গোটা বিশেক।

দিচ্ছি। তুমি একটা শুকনো কাপড় পরো। আমি রিকশা আনিয়ে দিই।

আগে একটু পানি দাও।

ঘর বন্ধ করে দোকানিরা শুয়ে পড়েছিল। আজহার খাঁ হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিকশাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, ধাক্কা দেন না স্যার, ভিতরে লোক আছে।

তিনি প্রাণপণে দরজায় ঘা দিলেন। ভেতর থেকে শব্দ এল— কে ? তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আমি। একটু খুলেন ভাই।

কী ব্যাপার ?

www.MurchOna.com

টাকা নিয়ে এসেছি। সেন্টের শিশিটা দিন।

খুট্ করে দরজা খুলে গেল। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দোকানদার তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন।

দোকানদার বলল, আপনার কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি।

এত রাতে আসলেন কেন ? সকালে আসলেই পারতেন।

রাত কত হয়েছে ?

সাড়ে বারো।

দ্রুতগতিতে রিকশা চলছে। তিনি শক্ত হাতে হুড চেপে ধরে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তাঁর মনে হলো তিনি যে-কোনো সময় ছিটকে পড়ে যাবেন।

বাড়ির কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকারে ডুবে আছে। একটি লাইটপোস্টেও আলো নেই। অল্প ঝড়-বাদলা হলেই এ দিককার সব বাতি নিভে যায়। রিকশা আজহার খাঁর বাড়ি থেকে একটু দূরে টগরদের বাড়ির সামনে থামল। তিনি দেখলেন, হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর তার মা বারান্দায় বসে আছে। রিকশার বাতি দেখে দু'জনই উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের জন্যে বুঝতে পারছে না কে এল।

আজহার খাঁ ডাকলেন, লিলি! লিলি!

জমে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মা ও মেয়ে দু'জনেই দ্রুত আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়লেন। যে জায়গাটায় তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি, তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।

লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা ?

গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। রঞ্জু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টিস্নাত গভীর রাত। ঘরের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে।

সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।

www.MurchOna.com

'টাকশাল থেকে সদ্য বের হওয়া ঝকঝকে কাঁচা রুপার টাকা।' এই উপমা বাংলা সাহিত্যে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করার পর আমার নিজেকে ঝকঝকে রুপার টাকা মনে হতে লাগল। চেষ্টা করলাম চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে আসতে। চলনে-বলনে শিক্ষকসুলভ স্থিরতা। হালকা কথাবার্তা বন্ধ। চপলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোভা পায় না। একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, দুটো সাবসিডিয়ারি কেমিস্ট্রি ক্লাস এবং M.Sc. Preliminary-তে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই হলো আমার দায়িত্ব।

আমি অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম দেওয়া একটা প্যাড ছাপিয়ে ফেললাম। প্যাডের এক কোনায় লেখা— হুমায়ূন আহমেদ, লেকচারার, রসায়ন বিভাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে চিঠি লিখব সে যেন আমার অবস্থানটা বুঝতে পারে। আমাকে এলেবেলে কেউ ভেবে না বসে।

শিক্ষক পরিচয় ছাড়াও আমার লেখক পরিচয়ও আছে। কাজেই লেখকের একটা উদাসী ভাবও চেহারায় আনার চেষ্টা করি। অন্যমনস্ক ভঙ্গি, খেয়ালি দৃষ্টি ইত্যাদি।

যখন ক্লাস থাকে না তখন চলে যাই *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার অফিসে। *দৈনিক বাংলার* সহ-সম্পাদক সালেহ চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করি। তিনি প্রায়ই নিয়ে যান কবি শামসুর রাহমান সাহেবের কামরায়। কবি তখন *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক। তাঁকে ঘিরে সব সময় ভিড়। দর্শনার্থীদের সঙ্গে কবি নানান ধরনের কথা বলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি এবং প্রায়ই ভাবি আমি এদের দলেরই মানুষ। আমাদের অবস্থান জাতির আত্মার কাছাকাছি। আমাদের জন্যই হয়েছে জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে। বড় ভালো লাগে। নিজের ভেতরে পবিত্র ভাব হয়।

দৈনিক বাংলা অফিসেই *বিচিত্রার* ঘরবাড়ি। *বিচিত্রার* সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী কোনার দিকের একটা ঘরে বসেন। তিনি তখন কাগজ ছেঁড়া নামক বিচিত্র রোগে ভুগছেন। সবসময় কাগজ ছিঁড়ছেন। ছেঁড়া কাগজের শব্দ না শুনে এক সেকেন্ডও থাকতে পারেন না। গাদা গাদা নিউজপ্রিন্ট তাঁর কাছে রাখা হয় ছেঁড়ার জন্যে।

www.MurchOna.com

মাঝে মাঝে শাহাদত ভাইয়ের ঘরে গিয়ে বসি। শাহাদত ভাই কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেন, ভালো?

জি ভালো।

চা খান। এই চা দাও।

চা দেওয়া হয়। আমি চা খাই। শাহাদত ভাই অন্যদিকে তাকিয়ে কাগজ ছিঁড়তে থাকেন।

বিচিত্রা অফিসে অনেকেই তখন কাজ করে। তাদের সবার নাক বেশ উঁচু। নাক উঁচু পত্রিকার কারণে। একটি ক্ষমতাধর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাই ক্ষমতার আঁচ অনুভব করেন। সেটাই স্বাভাবিক। তারা খুব একটা কথা বলেন না। লেখকশ্রেণীকে পাত্তা দেন না। লেখকরা তাদের তোয়াজ করে চলবে এটাই আশা করেন। আমি তোয়াজটা কীভাবে করব বুঝতে না পেরে কিছুটা কনফিউজড বোধ করি।

বিচিত্রার শাহাদত ভাইয়ের অফিসে একদিন বসে আছি, তিনি যথারীতি কাগজ ছিঁড়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে পূজাসংখ্যা বের হয়। আমাদের দেশে ঈদসংখ্যা বলে কিছু নেই। ঈদ মানেই কোলাকুলি এবং সেমাই। ঠিক করেছি এবার ঈদসংখ্যা বের করব। আপনি একটা উপন্যাস দেবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই।

আনন্দে ঝলমল করছি। *বিচিত্রা* আমার কাছে উপন্যাস চাচ্ছে, আমি তাহলে লেখক হয়েই গেছি। এই প্রথম উপন্যাস লিখছি একজনের ফরমায়েশে। কী লেখা যায়? গ্রামের পটভূমিতে কিছু লিখি নি। গ্রামে গল্পটা শুরু করলে কেমন হয়? গ্রামের স্মৃতি তেমন নেই। ঠিক করলাম দশদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে যাব। দাদার বাড়ি, কিংবা নানার বাড়ি। উপন্যাসটা সেখানেই লিখে শেষ করব।

ইউনিভার্সিটিতে ছুটির দরখাস্ত করতে হয় রেজিস্ট্রারের কাছে। সেই দরখাস্ত রেকমন্ড করবেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান।

দরখাস্ত করলাম। অফিসে জমা দিলাম। খন্দকার স্যার বিরক্ত গলায় বললেন, মাত্র সেদিন জয়েন করেছ। এখনি ছুটি? কী জন্য ছুটি চাও?

কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না, লেখালেখির জন্য ছুটি চাচ্ছি শুনলে স্যার সম্ভবত আরো রাগবেন।

আমি মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছি। স্যার বললেন, লিখেছ অতি জরুরি কারণে ছুটি দরকার। অতি জরুরি কারণটা কী?

www.MurchOna.com

স্যার, ছুটি লাগবে না।

গুড। যাও ঠিকমতো ক্লাস নাও।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে এলাম। গ্রামের পটভূতিতে উপন্যাস লিখতে হবে এটা মাথা থেকে দূর করে দিলাম। ঠিক করলাম শহরকেন্দ্রিক উপন্যাসই লিখব। মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। বাবা-মা ও দুই বোন। গল্পটা মাথার ভেতর তৈরি হতে থাকল। যতক্ষণ ক্লাসে থাকি ততক্ষণ মাথায় গল্প থাকে না। ক্লাস থেকে বের হলেই মাথায় গল্প ঘুরঘুর করতে থাকে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়িয়ে তখন খুবই আরাম পেতাম। বিজ্ঞান মানেই যে—'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টতি অগ্রে' না।

বিজ্ঞানে অপূর্ব রহস্য আছে। রহস্য জানা এবং না-জানার আনন্দ আছে তা ছাত্রদের বলতে পেরে ভালো লাগত। প্রাণপণ চেষ্টা করতাম অতি জটিল বিষয় সহজে ব্যাখ্যা করার।

একদিন ক্লাসে বললাম, মনে করো God লুডু খেলছেন। তিনি যখন দান দেবেন তখন ছক্কার গুটিতে কত উঠবে তাকি আগে থেকে বলতে পারবেন?

সবাই একসঙ্গে বলল, অবশ্যই পারবেন।

আমি বললাম, তোমাদের চিন্তার সঙ্গে আইনস্টাইনের চিন্তার মিল আছে। আইনস্টাইনও ভাবতেন, পারবেন। আসলে কিন্তু তা-না। মানুষের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা, গডের ক্ষেত্রেও তা। একটি বস্তুর গতি এবং অবস্থান যেমন মানুষ একই সঙ্গে বলতে পারবে না, অনিশ্চয়তা থাকবে, গডের ক্ষেত্রেও তা।

আমার অতি সরল ব্যাখ্যা ছাত্রছাত্রীদের খুব যে কাজে এল তা না। পরীক্ষার খাতায় তারা উদ্ভট উদ্ভট উত্তর লিখতে লাগল। একটা প্রশ্ন ছিল, ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল প্রভেদটা কী?

এক ছাত্র উত্তর লিখল— ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্সে ঈশ্বর পাশা খেলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তিনি পাশা খেলেন না।

আমি তখনি ঠিক করলাম, ছাত্রদের জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা টেক্সট বই লিখব। যেখানে অতি Abstract এই বিষয়টি বোধগম্য ভাষায় লেখা হবে। ছাত্ররা সেই বই ভয় নিয়ে পড়বে না, আনন্দ নিয়ে পড়বে। পিএইচডি করে ফেরার পর সেই বই লিখেছিলাম। নাম *কোয়ান্টাম রসায়ন*।

বিচিত্রার উপন্যাসে ফিরে যাই।

লেখা শুরু করার পরে দেখি গল্প শুরু হয়েছে গ্রাম্য পটভূমিতে। কিছুতেই পাত্রপাত্রীদের ঢাকা শহরে আনা যাচ্ছে না। সেদিন প্রথম মনে হলো লেখালেখির

www.MurchOna.com

পুরোটা লেখকের হাতে থাকে না। তার পেছনে অন্যকেউ থাকে। মূল সুতা যার হাতে।

বিচিত্রার প্রথম ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার উপন্যাসটির নাম *অচিনপুর*।

বিস্ময়কর মনে হলেও সত্যি— আমাকে লেখকখ্যাতি এনে দিল এই উপন্যাসটি। কারণ *বিচিত্রার* কারণে বহু পাঠক এই লেখাটা পড়ল।

উপন্যাসের জন্য আমি তিনশ' টাকা পেলাম। সেই দিনই খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির খান সাহেবও আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলেন *নন্দিত নরকে* এবং *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাসের রয়েলটি বাবদ, যেখানে চারশ' টাকা আছে। টাকা নিয়ে ফিরছি, স্টুডেন্ট ওয়েজের মালিক ডেকে দোকানে বসালেন। তারা আমার একটা উপন্যাস ছাপতে চান। এই উপলক্ষে দুশ' টাকা অ্যাডভান্স দিলেন। জীবনে প্রথম কোনো উপন্যাসের জন্য অ্যাডভান্স টাকা পাওয়া।

বেতনের ডবল টাকা নিয়ে বাসায় ফিরেছি। কেমন যেন অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে এই টাকার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। এই টাকা অন্য কারোর।

অচিনপুর উপন্যাসের কিছুটা পড়লে কেমন হয়?

অচিনপুর

মরবার পর কী হয়?

আট-ন' বছর বয়সে এর উত্তর জানবার ইচ্ছে হলো। কোনো গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তার বয়স সেটি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি সেই সময়ে আমি মৃত্যুরহস্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নবু মামাকে নিয়ে গা ধুতে গিয়েছি পুকুরে। চারদিকে ঝাপসা করে অন্ধকার নামছে। এমন সময় হঠাৎ করেই আমার জানবার ইচ্ছে হলো, মরার পর কী হয়? আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, নবু মামা, নবু মামা।

নবু মামা সাঁতরে মাঝপুকুরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। আমি আবার ডাকলাম, নবু মামা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

আর একটু।

ভয় লাগছে আমার।

একা একা পাড়ে বসে থাকতে সত্যি আমার ভয় লাগছিল। নবু মামা উঠে আসতেই বললাম, মরার পর কী হয় মামা? নবু মামা রেগে গিয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা কী বাজে কথা বলিস? নবু মামা ভীষণ ভীতু ছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর ভয় ধরে গেল। সে সন্ধ্যায় দু'জনে চুপি চুপি ফিরে চলেছি। রইসুদ্দিন চাচার

কবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি, সেখানে কে দুটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। দুটি লিকলিকে ধোঁয়ার শিখা উড়ছে সেখান থেকে। ভয় পেয়ে নবু মামা আমার হাত চেপে ধরলেন।

শৈশবের এই অতি সামান্য ঘটনাটি আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। পরিণত বয়সে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোট একটি ছেলে মৃত্যুর কথা মনে করে একা কষ্ট পাচ্ছে— এ ভাবতেও আমার খারাপ লাগত।

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে ? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি ? সোনাখালি খালের বাঁধানো পুলের ওপর বসে থাকতে থাকতে একসময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে ?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। একা একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরআন পড়তে শুরু করেছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরআন-পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠত। নানিজান বলতেন, 'কানার কাছে এখন কেউ যেও না গো।' শুধু কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, 'পুলাপান কুয়াতলায় কেউ যেও না।' কুয়াতলায় সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভালো থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প : হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তাঁর চাচা। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, অমনি পেছন থেকে নাকি সুরে কে চেঁচিয়ে উঠল, মাঁছটা আঁমারে দিয়ে যাঁ।

রাতেরবেলা ঘুমিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়তো ঝুপ করে শব্দ হলো বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, পেতত্নি নাকি ? পেতত্নি নাকি রে ?

নবু মামা প্রায় আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল, সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটিমাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই না তাকাত আমাদের দিকে! নবু মামা বলত, ঐ বুড়ি আমার দিকে তাকালে কঞ্চি দিয়ে চোখ গেলে দেব। কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝেমধ্যে বলত, পুলাপান ডরাও কেন? আমি কিতা? পেত্নী? পেত্নী না হলেও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। শুধু আমরা নই, বড়রাও তাকে সমীহ করে চলতেন। আর সমীহ করবে নাই-বা কেন? বড় নানিজানের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তাঁর বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। একদিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায় মরোমরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন যায় তখন যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর। খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মড়ার মাথার কাছে বসে কোরআন পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনি। আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ। কারণ কানাবিবি সে সময়ে ভালো মানুষের মতো উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এরপর থেকে স্বভাব-চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হলো তার। দিনরাত নামাজ-রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজ-কবজ দিচ্ছে। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরআন পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনেরবেলাও কি নিস্তার আছে? গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পুবের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, অমনি রহমত মিয়া বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছে, খাইয়া ফেলামু। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কচ কচ কচ। ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা। ব্যাপারটাই ভয়াবহ! বদ্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয় নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মতো ঘিরে রয়েছে আমার চারদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্পবয়সের ভয়কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবু মামার হাত ধরে ঘুমোতে যাচ্ছে দোতলার ঘরে। নবু মামা বলছেন, তুই ভেতরের জানালা দুটি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে। আমি বলছি, আমার ভয় করছে, আপনিও আসেন। মামা মুখ ভেংচে বলছেন,

www.MurchOna.com

এতেই ভয় ধরে গেল! টেবিলে রাখা হারিকেন থেকে আবছা আলো আসছে। আমি আর নবু মামা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নবু মামা শুতে-না-শুতেই ঘুম। একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খটখট করে কে যেন এদিকে আসছে। মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে। আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানতেও পারি নি সে-রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে-রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, আর ঘুমিয়ে কী করবি, আয় বেড়াতে যাই। আমরা সোনাখালি খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের ওপর দুজনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সেবার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশিরভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সবকিছু। মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, রঞ্জু, আজ তোর খুব দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কী করতে হয়, জানিস?

না।

হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্লা বলেন, একে দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?

বুঝেছি।

বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তার হাসিতে চারদিক গমগম করতে লাগল। আমিও তার সঙ্গে গলা মেলালাম। বাদশা মামা বললেন, আজ আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে। আমি মহাখুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কত দিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

www.MurchOna.com

দীর্ঘদিনের জন্য যারা দেশের বাইরে যায়, তারা সঙ্গে কী নেয়? আমার অনুমান একটা জায়নামাজ (বাবা-মাকে খুশি রাখার জন্য), গানের সিডি, রান্নার বই। যারা নিজেদের ইনটেলেকচুয়েল মনে করেন তারা রবীন্দ্রনাথের এক কপি *সঞ্চয়িতা* নেন (কখনো সেখান থেকে কিছু পাঠ করা হয় না)।

আমি দীর্ঘদিনের জন্যে আমেরিকা যাচ্ছি। Ph.D নামক ডিগ্রি করে ফিলসফার টাইটেল পাব। আমি সঙ্গে নিচ্ছি একটা বিশাল বই। মরিসন অ্যান্ড বয়েডের লেখা *Organic Chemistry.* বাজারে আমার নিজের তখন চারটি বই— *নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, তোমাদের জন্য ভালোবাসা, অচিনপুর।*

বইগুলোর একটি করে কপি হলেও সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। কেন নেই নি তা এখন আর মনে নেই। হয়তো নিজের লেখা বইগুলো সঙ্গে নিতে লজ্জা পাচ্ছিলাম।

Organic Chemistry-র বিশাল বই সঙ্গে নেওয়ার একটাই কারণ। এই বিষয়ে আমি অত্যন্ত দুর্বল। শুনেছি ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দিনেই তারা একটা পরীক্ষা নেয়। আমি নিশ্চিত পরীক্ষা নিলেই আমি এই বিষয়ে ফেল করব। দীর্ঘদিন ভ্রমণে যতটা পারা যায় ঝালিয়ে নেওয়া।

আমি যাচ্ছি North Dakota State University-তে। তিনটা ইউনির্ভার্সিটি আমাকে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ অফার করেছে। এর অর্থ আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ক্লাস নেব, তার বিনিময়ে Ph.D করার সুযোগ।

North Dakota State University বেছে নেবার পেছনের কারণ কিন্তু সাহিত্য। রসায়ন না। *Little house in the Praire*-র লেখিকা যে-জীবনের কথা বলেছেন তা North Dakota-র। উনার বই ছোটবেলায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছি। তাঁর অনেকগুলো বই অনুবাদ করেছিলেন জাহানারা ইমাম। প্রথম বইটির নাম তিনি দিয়েছিলেন *ঘাসের বনে ছোট্ট কুটির*। লরা ইঙ্গেলসের প্রতিটি বই পড়ে গহীন অরণ্য, বরফের কাল, শিকার, প্রেইরি ল্যান্ডে যাত্রার গল্প পড়ে কতবার ভেবেছি— আহা, তারা কী সুখেই না ছিল!

www.MurchOna.com

ইউনিভার্সিটিতে Orientation হচ্ছে। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রচণ্ড শীতের এই Fargo শহর আমি কেন পছন্দ করলাম ? গরম অঞ্চলের ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে কেন শীতের দেশের ইউনিভার্সিটি ?

আমি লরা ইঙ্গেলসের নাম করলাম।

শিক্ষক ভুরু কুঁচকে বললেন, Who is she ?

আমি হতভম্ব! (এখন হতভম্ব হই না। এখন আমি জানি পৃথিবীর সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশেষ জ্ঞান জানলেও সাধারণ জ্ঞানে সামান্য 'Sof')

মাসে আমার বেতন ৪৫০ ডলার। প্রথম মাসের বেতন পেয়েই মাকে একশ' ডলার পাঠালাম। তাঁকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় রেখে এসেছি (পাঠক! কপর্দক মানে কী ? সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হচ্ছে)। গুলতেকিনের পেটে তখন আমার বড় মেয়ে। তার পৃথিবীতে আসার সময় হয়ে এসেছে, অথচ তার মা'র হাতও শূন্য। কী যে অবস্থা! একশ' ডলার পাঠিয়ে খুবই স্বস্তি পেলাম।

আমেরিকায় আমার নতুন জীবন শুরু হলো। সেখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুপস্থিত। রসায়নময় জীবন। আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের প্রবলেম ক্লাস নেই। নিজে ক্লাস করি। প্রতি সপ্তাহেই পরীক্ষা। আমি ডাঙার মাছের মতোই খাবি খাচ্ছি।

প্রবলেম ক্লাসেও নানা সমস্যা। ছাত্রদের ইংরেজি বুঝি না। ওরাও আমার ইংরেজি বুঝে না। উদাহরণ দেই। এনট্রফির একটা অংশ আমি বেশ সময় নিয়ে বুঝালাম। তখন এক ছাত্রী উঠে দাঁড়াল। বিনীত গলায় বলল, 'তুমি যে কথাগুলো বললে তাকি এবার ইংরেজিতে বলবে ?' সারা ক্লাসে হাসির শব্দ। আমি হাবার মতো দাঁড়িয়ে কী করব বুঝতে পারছি না।

প্রবলেম ক্লাস মূলত রসায়নের অঙ্কের ক্লাস। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্ভট প্রবলেম নিয়েও উপস্থিত হয়। যেমন এক ছাত্র বলল, সে এক ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করছে কিন্তু সেই মেয়ে তাকে চুমু খেতে দিচ্ছে না। একজন ইন্ডিয়ান হিসাবে এই প্রবলেমের সমাধান কী বলে তুমি মনে কর ?

আমার থাকার জায়গা নিয়েও সমস্যা। প্রথমে এক আমেরিকান বুড়ির বাড়িতে উঠলাম। সে তার বাড়ির দোতলায় কয়েকটা এলোমেলো রুম বানিয়ে রেখেছে। রুমগুলো ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের ভাড়া দেয় (আমি কালো গাত্রবর্ণের কারণে তার কাছে ইন্ডিয়ান। সে বাংলাদেশের নাম কখনো শোনে নি।) দোতলায় একটা বাথরুম, তার কোনো দরজা নেই। বুড়ির যুক্তি— 'তোমরা ছেলেরা ছেলেরা বাস কর। তোমাদের প্রাইভেসির দরকার কী ?'

www.MurchOna.com

তার বাড়ির দশ গজের ভেতর কোনো সিগারেট খাওয়া যাবে না। আমি সিগারেট খাই শুনে সে আমার বিছানার ওপর একটা স্মোক ডিটেকটর লাগিয়ে দিল।

অদ্ভুত কোনো কারণে আমার প্রতি বুড়ির আচার-আচরণ হঠাৎ বদলে গেল। তার আদর এবং যত্নে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। এক পর্যায়ে সে বলল, তুমি আমাকে মা ডাক। এ দেশে আমিই তোমার মা। একদিন বলল, তোমার ঘরের স্মোক ডিটেকটরের কানেকশন আমি অফ করে দিলাম। ঠান্ডার মধ্যে সিগারেট খাবার জন্য বাইরে না গিয়ে এখন ঘরেই খাবে। তবে খবরদার অন্য বোর্ডাররা যেন জানতে না পারে। প্রতি রবিবার আরেক যন্ত্রণা। বুড়ি আমাকে চার্চে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি মুসলিম। আমি কেন চার্চে যাব?

বুড়ি বলল, গডের চার্চে সব ধর্মের লোক যেতে পারে।

আমি বললাম, আমি যাব না।

বুড়ি মন খারাপ করে চলে যায়। পরের রবিবারে আবার আসে।

পৃথিবীতে অনেক ধরনের অত্যাচার আছে। ভালোবাসার অত্যাচার হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার। কারণ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনোই কিছু বলা যায় না। সহ্য করে নিতে হয়।

ফার্গো শহরে প্রথম বরফ পড়ল। পুরো এলাকা ঢেকে গেল বরফে। বুড়ি আমার রুমে উপস্থিত। আমার জন্য বরফে হাঁটার জুতা নিয়ে এসেছে। ঘটনার এখানেই ইতি নয়। বুড়ি ঘোষণা করল, সে আমাকে হাত ধরে ধরে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাবে। কারণ বরফে হাঁটার বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পিছলে পড়ে পা ভাঙতে পারি।

অনেক চেষ্টা করেও আজ আমি ওই মমতাময়ীর নাম মনে করতে পারছি না। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ লাগছে।

সব নিরানন্দের মধ্যেই নাকি কিছু আনন্দ লুকানো থাকে। বুড়ির অন্ধকার কোঠায় হঠাৎ একদিন আনন্দের সন্ধান পেলাম। একা একা বই পড়ার আনন্দ। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি সায়েন্সের বই ছাড়াও গল্প-উপন্যাসের বিশাল কালেকশন। এর আগে নুট হামসুনের একটা মাত্র বই পড়েছি—*Vagabond*। তাঁর অন্য বইগুলো পড়ার খুব শখ ছিল। বাংলাদেশে পাই নি। লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি কম্পিউটারের বোতাম চেপে বললেন, আমাদের কাছে তাঁর তিনটি বই আছে। তুমি চাইলে বাকিগুলোও আনিয়ে দেব।

আমি বললাম, কীভাবে?

www.MurchOna.com

লাইব্রেরিয়ান বললেন, আমাদের Inter library loan system আছে। যে বই আমাদের নেই, সেই বই আমরা পনেরো দিনের জন্য আমেরিকার যে-কোনো লাইব্রেরি থেকে লোন করে আনতে পারি।

আমি সরল বাংলায় বললাম, খাইছে আমারে।

লাইব্রেরিয়ান চোখ কপালে তুলে বলল, তার মানে ?

আমি বললাম, এটা আমাদের বাংলা ভাষার একটা শব্দ। এর মানে হলো— I have been eaten.

কিছুই বুঝতে পারছি না। কে তোমাকে খেয়েছে ?

তোমার অপূর্ব System.

লাইব্রেরিয়ানের বয়স চল্লিশ। হিজড়ার মতো দেখতে একজন মহিলা। শুষ্কং কাষ্ঠং। তাকে মানুষ মনে হয় না। মনে হয় ব্যাকরণের বই।

চিড়িয়াখানায় যে লোক জিরাফের দেখাশোনা করে তার গলা খানিকটা লম্বা হয়ে যায়। যে মহিলা লাইব্রেরিতে কাজ করবেন, তিনি বইয়ের মতো হয়ে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক।

একটা পর্যায়ে ভদ্রমহিলা আমার বই পড়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন। লাইব্রেরিতে গেলেই তিনি আমাকে ঘরে বানানো কালো কেক খেতে দেন (অতি অখাদ্য), কফি খেতে দেন (কেকের চেয়েও অখাদ্য)।

থ্যাংকস গিভিংয়ে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে টার্কি খাবার দাওয়াত করলেন। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী এক বোতল রেড ওয়াইন কিনে (জীবনে প্রথম নিজের পয়সায় মদ কেনা) উপস্থিত হলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এইভাবে— এর নাম হুমায়ূন। বাংলাদেশ থেকে এসেছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে এর মতো পড়ুয়া ছেলে নেই। সে সব বই পড়ে ফেলেছে।

ভদ্রমহিলার স্বামী, মা-বাবা সবাই খুব মাথা দোলাতে লাগল যেন এমন আনন্দের খবর তারা এর আগে শোনে নি। ভদ্রমহিলা আমাকে Robert Frost-এর কবিতার বইয়ের একটি রাজকীয় সংস্করণ উপহার দিলেন। বইয়ের ওপর লেখা—

> To a person who loves book
> and books love him.

খাবারের টেবিলে টার্কি নামের বিশাল পক্ষী রোস্ট করা অবস্থায় আছে। তার পেটভর্তিও নানান খাবার। টার্কির মাংসের রঙ একেক জায়গায় একেক রকম।

www.MurchOna.com

কোনোটা কালো, কোনোটা লাল, কোনোটা সাদা। আমাকে প্রত্যেক জায়গা থেকে খানিকটা করে কেটে দেওয়া হলো। আমি খাবার মুখে দিয়ে শিউরে উঠলাম। বিকট বোঁটকা গন্ধ। এই দ্রব্য খাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। বমি করতে করতেই মারা যাব। এই বিপদ থেকে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়?

আমি মুখ কাচুমাচু করে বললাম, টার্কির মাংস যে খেতে অসাধারণ হয়েছে তা গন্ধ থেকেই টের পেয়েছি, কিন্তু আমি নিরামিশাষি, আমি মাছ-মাংস-ডিম কিছুই খাই না। আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। এক প্লেট সালাদ আর আপেল পাই আমার জন্য যথেষ্ট।

আমেরিকায় পড়াশোনা করা অবস্থাতেই খবর পাই আমাকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বাজারে আমার তখন মাত্র চারটা বই। বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। আমি পেয়ে গেছি বাংলা একাডেমী পুরস্কার?

লাইব্রেরিয়ানকে খবরটা দিতে গেলাম। তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, তুমি যে একজন লেখক এই খবরটা তো আমাকে কোনোদিন বলো নি। আমি বললাম, পড়াশোনার চাপে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, Standing ovation for a fiction writer.

অবাক হয়ে দেখি বিদেশিনীর চোখ ছলছল করছে। এক জীবনে পরম করুণাময় কতভাবেই না আমাকে আনন্দ দিয়েছেন।

www.MurchOna.com

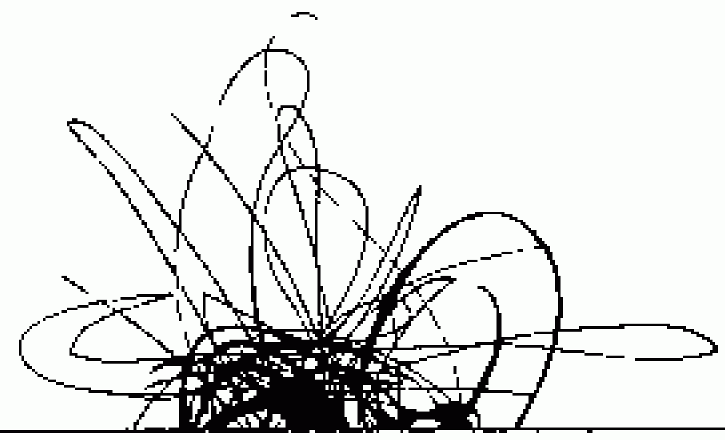

আমি যে লেখক না— এই বিষয়টি আমেরিকায় যাবার পর স্পষ্ট হয়ে গেল। টানা পাঁচ বছর আমেরিকায় ছিলাম। Ph.D করেছি, পোস্ট ডক করেছি। এই পাঁচ বছরে এক লাইনও লিখি নি। গল্প-উপন্যাসের তো প্রশ্নই ওঠে না।

একজন সত্যিকার লেখক না লিখে থাকতে পারবেন না। তাকে কিছু না কিছু লিখতেই হবে। একজন তবলাবাদক তবলা না পেলে টেবিলে বা চেয়ারে বোল তোলেন। একজন গায়ককে গুনগুন করতেই হয়। সেখানে আমি কীভাবে না লিখে পারছি ? আমার সমস্যাটা কী ?

প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ। লেখার সময় নেই।— এইসব ভুয়া কথা। একজন লেখক প্রচণ্ড কাজের চাপের ভেতর থেকেও লেখার সময় বের করে নেবেন। তাহলে আমি কেন পারছি না ? সমস্যাটা কি পরিবেশ ? বাংলাদেশের আলো-বাতাস গায়ে লাগছে না বলেই বাংলা ভাষার লেখকের বলপয়েন্ট দিয়ে কালি বের হচ্ছে না ? বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ শুনছি না, ব্যাঙের ডাক শুনছি না— এটাই কি সমস্যা ?

মা'কে চিঠি লিখলাম তিনি যেন ক্যাসেটে ব্যাঙের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ রেকর্ড করে পাঠান। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব ক্যাসেট রেকর্ডার নিয়ে বৃষ্টির দিনে বনবাদাড়ে ঘুরতে লাগল। যথাসময়ে বর্ষা এবং ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট চলে এল।

আমি তখন ইউনিভার্সিটি হাউজিং-এ চমৎকার বাড়ি পেয়েছি। ডুপলেক্স বাড়ি। একতলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দোতলায় দু'টা শোবার ঘর। গুলতেকিন তার কন্যাকে (নোভা) নিয়ে চলে এসেছে। মেয়ের বয়সও দেখতে দেখতে তিন বছর হয়ে গেছে। নিখুঁত বাংলা এবং নিখুঁত ইংরেজিতে হড়বড় করে কথা বলে। উইকএন্ডে আশেপাশের সব বাঙালি চলে আসে। খিচুড়ি-মাংস রান্না হয় এবং ক্যাসেটে বৃষ্টির শব্দ ও ব্যাঙের ডাক বাজে। বাঙালি ছেলেগুলির চোখ ছলছল করতে থাকে।

বাদলা দিনে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।।

www.MurchOna.com

আমার জীবনচর্যা সম্পর্কে বলি। সামারে দুই মাস কাজের চাপ থাকে না। সবাই ভ্যাকেশনে যায়। আমার ভ্যাকেশনে যাবার ডলার নেই। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দিলাম। চাষি হুমায়ূন। আমার সঙ্গী মেয়ে নোভা। পিতা-কন্যা দু'জনের হাতেই খুরপা। আমরা মাটি কোপাই। বীজ বুনি। গাছে পানি দেই। এই সময়টায় মেয়ের সঙ্গে নানা গল্প করি। সবই বাংলাদেশের গল্প। বাংলাদেশের বিশাল নদী, বাঁশবাগানে জোছনা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং হরিণে ভর্তি সুন্দরবন, বিশাল সমুদ্র, সিলেটের ডিঙ্গিপোতা হাওর যেখানে সমুদ্রের মতো বড় বড় ঢেউ ওঠে।

নোভা চোখ বড় বড় করে শোনে। একদিন সে বলল, আমাদের দেশটা "a piece of paradise", তাই না বাবা ?

আমি বললাম, অবশ্যই তাই। তবে একটু ভুল করেছ। আমি নিশ্চিত Paradiseও এত সুন্দর না।

আমি অতি ভাগ্যবান, আমি আমার জীবন Paradise-এ কাটিয়ে দিতে পারছি। আমার মেয়েটা ভাগ্যবতী না। তার জীবন কাটছে আমেরিকায়। সে এবং তার স্বামী না-কি ঐ দেশের নাগরিকত্বও পেয়েছে। মেয়েটির কি কখনো তার বাবার সঙ্গে কথোপকথন মনে পড়ে ? জানি না। আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন তার কোনো যোগাযোগ নেই।

শুরুতে যে তথ্য দিয়েছি, লেখালেখি কিছুই করি নি, সেখানে সামান্য ভুল আছে। চিঠি লিখতাম। মা'কে, ভাইবোনদের। আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ ? এর বাইরে চিঠিতে তেমন কিছু লেখার থাকে না। দেশের সবাই চায় অনেকক্ষণ ধরে চিঠি পড়তে। কাজেই আমি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু লিখতাম যা মোটেই সত্যি না। যেমন একবার টর্নেডোর বর্ণনা দিলাম। একবার লিখলাম ব্লিজার্ডে কীভাবে আটকা পড়েছিলাম। Frost bite হয়ে গেছে।

এইসব কি সাহিত্যের আওতায় পড়বে ? Vladimir Nabokov (বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক এবং সমালোচক)-এর মতে এইসবও সাহিত্যের মধ্যে পড়বে। তিনি বলছেন, Neanderthal যুগে একটি বালক গুহা থেকে চিৎকার করতে করতে বের হলো— নেকড়ে বাঘ! নেকড়ে বাঘ! দেখা গেল তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে নেকড়ে বাঘ। তখন কিন্তু সাহিত্যের জন্ম হলো না। সাহিত্যের জন্ম হলো তখনি যখন একটা বালক চিৎকার করতে করতে আসছে— নেকড়ে বাঘ! নেকড়ে বাঘ! অথচ তার আশেপাশে কোনো নেকড়ে বাঘ নেই।

www.MurchOna.com

আমেরিকায় শুরুতে বেশ অর্থকষ্টে ছিলাম। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি। বড় মেয়ের প্রথম জন্মদিন। তারিখটা বেকায়দা ধরনের, ২৮ আগস্ট। মাসের শেষদিকে। বেতনের চেক পেতে আরো তিনদিন লাগবে। হাতের সব ডলার শেষ। মেয়ের মা'র মেয়ের প্রথম জন্মদিন নিয়ে নানান পরিকল্পনা। আমি উপহার কিনে নিয়ে এলাম দুই কেজি ময়দা। মেয়ে ময়দা ছানতে পছন্দ করে। আমি প্যাকেট খুলে মেয়ের চারপাশে ময়দা বিছিয়ে দিলাম। সে মহানন্দে দুই হাতে ময়দা ছানাছানি করতে লাগল। সে আনন্দে যতই হাসে, তার মা দুঃখে ততই কাঁদে। মেয়ের প্রথম জন্মদিনে দুই কেজি ময়দা!

তার কষ্ট দেখে আমি বলেছিলাম, দোয়া করছি যেন তোমার সব ছেলেমেয়ে থাকে দুধেভাতে। যেন তারা কখনো অর্থকষ্টে না পড়ে। পরম করুণাময় আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

গুলতেকিন আমার অর্থকষ্ট লাঘবের জন্যে কাজে নেমে পড়ল। বেবি সিটিং করে। পত্রিকার অ্যাড দেখে কাপড় এনে রিফু করে দেয়। এইসব বিষয় অন্য বইগুলিতে বিস্তারিত লিখেছি বলে এখানে আর লিখলাম না।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। আমার প্রফেসর একদিন আমাকে ডেকে বললেন, তোমার কর্মকাণ্ডে আমি যথেষ্ট অসুখী (Very unhappy). তোমার টিচিং অ্যাসিসটেন্সশিপ বাতিল করা হলো।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এই লোক বলে কী ? আমি খাব কী ?

প্রফেসর বললেন, যাও Mail box চেক কর। আমাকে Blank look দেবে না। Studentদের Blank look আমার একেবারেই পছন্দ না।

আমি মেইল বক্স চেক করতে গেলাম। সবার জন্যে আলাদা আলাদা মেইল বক্স। আমারটা খুলে একটা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা— তোমার Performance এ আমরা খুশি। তুমি যাতে মনেপ্রাণে Ph.D ডিগ্রির জন্যে কাজ করতে পার তার জন্যে তোমাকে স্কলারশিপ দেয়া হলো। তোমাকে এখন আর টিচিং অ্যাসিসটেন্সশিপ করতে হবে না।

স্কলারশিপের পরিমাণ ৫৫০ ডলার। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আগে পেতাম ৪৫০ ডলার।

আমেরিকানরা মজা করতে পছন্দ করে। আমার প্রফেসর আমার সঙ্গে একটু মজা করলেন। এখানে যাঁর কথা লিখছি তাঁর নাম প্রফেসর Jeno Wicks. তিনি আমার Ph.D Guide ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিভাগের চেয়ারম্যান। ফার্গো শহরে তাঁর ছবির মতো সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির পেছনে ছিল সুইমিং পুল। তিনি আমেরিকান সব উৎসবে বিদেশী ছাত্রদের তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করতেন।

www.MurchOna.com

প্রচুর আয়োজন থাকত। তাঁর যুক্তি— বিদেশী ছেলেমেয়েগুলি নিজের দেশ ছেড়ে এখানে একা একা বাস করছে। তারা উৎসব উপলক্ষে কিছুক্ষণ আনন্দ করুক।

গত বৎসর প্রফেসর জেনো উইকস মারা গেছেন। নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি তাদের বুলেটিনের মাধ্যমে জানিয়েছে, প্রফেসর জেনো উইকস তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ইউনিভার্সিটিকে দান করে গেছেন।

আমি আমার এক জীবনে অনেক মহাপ্রাণ মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। জীবনের এই সঞ্চয় তুচ্ছ করার মতো নয়।

প্রফেসর জেনো উইকস আমার প্রফেসরদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে আমি আমার লেখক পরিচয় দিয়েছিলাম। গুলতেকিন তার সঙ্গে দেশ থেকে আমার প্রতিটি বইয়ের কয়েকটা করে কপি নিয়ে এসেছিল। আমি তাঁকে বইগুলি দেখালাম। তিনি বললেন, কোন ভাষায় লেখা ?

আমি বললাম, বাংলা।

তিনি বললেন, তোমাদের অক্ষরগুলি তো চায়নিজদের চেয়েও জটিল। বসো আমার সামনে। আমি বসলাম। তিনি ল্যাবরেটরির সব ছাত্রছাত্রীকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে লজ্জায় ফেলে আমার লেখক পরিচয় দিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, পড়ে শোনাও।

আমি বললাম, স্যার, কেউ তো কিছু বুঝবে না।

প্রফেসর বললেন, না বুঝলে নাই। তোমাকে পড়তে বলছি তুমি পড়।

আমি *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়লাম। আমার প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তিনি খুবই আনন্দ পাচ্ছেন। পাঠ শেষ হলে প্রফেসর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন লাগল ?

কেউ কিছু বলল না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শুধু কোরিয়ান ছাত্র 'হান' বলল— মনে হচ্ছে মাথার ভেতর কিছু ছোট ছোট পোকা ঢুকে কিলবিল করছিল।

প্রফেসর বললেন, এই লেখক সপরিবারে আজ রাতে আমার বাসায় ডিনার করবে। তোমাদের নিমন্ত্রণ। A special night with a writer.

দেশে ফিরে আমি আমার একটা বই উৎসর্গ করলাম প্রফেসর জেনো উইকসকে। সেই বই তাঁকে পাঠাই নি এবং খবরটাও জানাই নি। আমি আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আমার পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়েছি। এটাই যথেষ্ট।

www.MurchOna.com

যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে যায়, তারা দেশে ফিরে ডিগ্রি নিয়ে। কেউ M.S কেউ Ph.D. আমি একটা Ph.D এবং সঙ্গে নতুন দু'টি মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরলাম। শীলা এবং বিপাশা। বিপাশার তখনো জন্ম হয় নি। সে তার মায়ের পেটে। শীলার মা দেশে ফেরাটা নিতে পারছিল না। তার কথা, দেশে আমি যা বেতন পাব তা দিয়ে সবাইকে তিনবেলা খাওয়াবার সামর্থ্যও থাকবে না। আমার একটাই যুক্তি, বিদেশে পড়াশোনা করতে এসেছি। পড়াশোনা শেষ— এখন দেশে ফিরব। অন্যদের মতো বিদেশে স্থায়ী হব না। যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমার বাবা শহীদ হয়েছেন, সে দেশকে অস্বীকার করে অন্যদেশের নাগরিকত্ব আমি নিতে পারব না।

খুব খারাপ অবস্থায় দেশে ফিরলাম। পকেটে আমেরিকার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের সঞ্চয় দুশ' ইউএস ডলার। একটা ফ্রিজও কিনেছিলাম। সেই ফ্রিজ জাহাজে করে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যে সময়ের কথা বলছি তখন বিদেশফেরতরা ফ্রিজ এবং টেলিভিশন আনতেন। টেলিভিশন কেনার টাকা ছিল না বলে শুধুই ফ্রিজ।

দেশে ফিরে আমার বড় মেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়। শুধু থালা হাতে নিরন্ন মানুষের দল বাড়িতে আসছে ভাতের জন্যে— এই দৃশ্য সে নিতে পারল না। তার ক্ষুদ্র জীবনে এই দৃশ্য সে দেখে নি। তার একটাই প্রশ্ন, এদের ফুড নেই কেন ?

বাসায় কোনো ভিখিরি এলেই নোভা দৌড়ে যেত রান্নাঘরে। যা পেত একটা থালায় সাজিয়ে ছুটে যেত নিচে। আমাকে যে প্রশ্ন করত এই প্রশ্ন সে ভিখিরিদেরও করত। আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইত, তোমাদের বাসায় ফুড নেই কেন ?

বড় মেয়েটির এই কাণ্ড তার দাদি খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাকে ডাকতেন 'মাদার তেরেসা' নামে।

আমেরিকা থেকে ফিরে নুরজাহান রোডের একটা বাসায় উঠলাম। একটা ঘরে আমার পরিবার। অন্য ঘরে আমার মা, শাহীন এবং ছোটবোন মনি।

আমার ঘরে একটা খাট পাতার পর আর জায়গা হয় না। সেই খাটে আমার

www.MurchOna.com

পরিবারের সবার জায়গা হয় না। আমরা ঘুমাই আড়াআড়ি (ময়মনসিংহের ভাষায় 'ফাত্তাইরা' হয়ে)।

বাসায় কোনো টেলিভিশন নেই। নোভা-শীলা টেলিভিশন দেখার জন্যে পাশের ফ্ল্যাটে যায়। টেলিভিশনে 'বাংলাদেশ' প্রোগ্রাম দেখতে তাদের না-কি খুব ভালো লাগে। তখন এত চ্যানেল হয় নি। বিটিভি সবেধন নীলমণি।

এক রাতের কথা। মেয়েরা খুব আগ্রহ করে টিভি দেখতে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ফিরে এসে জানালো, ঐ ফ্ল্যাটে মেহমান এসেছে। কাজেই তাদেরকে আজ টিভি দেখতে দেয়া হবে না। বাচ্চারা খুবই মন খারাপ করল। তাদের চেয়েও মন খারাপ করল বাচ্চাদের মা। কেন বাংলাদেশে এসেছি ? কী পাচ্ছি বাংলাদেশে ? একটা টিভি কেনার সামর্থ্য নেই!— ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাতে ভাত খাবার সময় বড় মেয়ে বলল, বাবা, তুমি আমাদের একটা টিভি কিনে দেবে ?

আমি বললাম, দেব।

রঙিন টিভি ?

আমি বললাম, অবশ্যই রঙিন টিভি।

কবে কিনে দেবে ?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। তবে একটা রঙিন টিভি যেভাবেই হোক কিনতে হবে এটা মাথায় ঢুকে গেল।

বিটিভির নওয়াজীশ আলি খান সাহেবের সঙ্গে তখন আমার সামান্য পরিচয় হয়েছে। আমার একটি নাটক তিনি বিটিভিতে প্রচার করেছেন। নাম খুব সম্ভব— 'প্রথম প্রহর'। তিনি আমাকে একটি ধারাবাহিক নাটক লিখতে বলছেন। আমি ধারাবাহিক নাটক লিখতে রাজি হলাম। ঠিক করলাম, একটি রঙিন টিভি কিনতে যত টাকা লাগে তত টাকার ধারাবাহিক নাটক লেখা হবে। যে নাটকটি লিখলাম তার নাম 'এইসব দিনরাত্রি'। নাটকটির পরিচালক ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান।

আমার রঙিন টিভি কেনার টাকা হওয়া মাত্র নাটকের একটি চরিত্র টুনির মৃত্যু দিয়ে নাটক শেষ করে দিলাম।

এই নাটকটির প্রতি আমি নানাভাবে ঋণী। নাটকটির কারণে আমি আমার বাচ্চাদের একটা শখ মিটালাম— রঙিন টিভি কিনলাম।

একটিমাত্র ধারাবাহিক নাটকের কারণে দর্শকদের কাছে হুমায়ূন আহমেদ নামটি পরিচিতি পেল। তারা এই নাট্যকারের লেখা গল্প-উপন্যাস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা শুরু করল।

www.MurchOna.com

এই নাটক প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব একদিন টেলিফোনে আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটা মজার জিনিস না-কি দেখাবেন। আমি মজার জিনিস দেখতে গেলাম।

মুস্তাফিজ সাহেব বললেন, একতলায় আমাদের একটা বিলবোর্ড আছে। বিলবোর্ডটা দেখে আসুন। আনন্দ পাবেন।

আনন্দ পাবার জন্যে বিলবোর্ড দেখতে গেলাম এবং আনন্দ পেলাম। বিলবোর্ডে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত *Statesman* পত্রিকার একটি খবর সেঁটে দেয়া আছে। সেখানে লেখা— 'আজ রাতে এইসব দিনরাত্রির শেষ পর্ব প্রচার হবে। এরপর আমরা কী দেখব ?'

বিটিভিতে নাটক লিখে খুব আনন্দ পেয়েছি। একের পর এক ধারাবাহিক নাটক— *অয়োময়, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই*। ঈদের হাসির নাটক। এক ঘণ্টার নাটক। আমি খুব সূক্ষ্মভাবে নাটকের ভাষা বদলানোর একটা চেষ্টা চালালাম। আগে কোলকাতার ভাষা (নদীয়া-শান্তিপুরের ভাষা বলাই ঠিক হবে) ছিল বিটিভি নাটকের ভাষা। যাই নি, খাই নি, জুতো, নৌকো। আমি চেষ্টা করলাম ঢাকার ভাষা বলে আলাদা কিছু দাঁড়া করাতে।

আমার ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় নি। আজকের নাটকের ভাষা 'নদীয়া-শান্তিপুর' মুক্ত।

বিটিভির একটি কর্মকাণ্ডে আহত হয়েছিলাম। *বলপয়েন্ট* লেখা মানেই আনন্দ অভিজ্ঞতার বয়ান না। মনোকষ্টের বয়ানও তো বটে। বিটিভি তার পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তির বিশাল অনুষ্ঠান করছে। পনেরোদিন ধরে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিটিভির নানান দিকের সাফল্য তুলে ধরা হচ্ছে। সেই বিপুল উৎসবে একটি নাম অনুচ্চারিত— হুমায়ূন আহমেদ। অথচ তখন আমার সব ক'টি ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত। টিভি নাটকে আমি কী করেছি কতটুকু করেছি তা 'বিটিভি'র কর্তাব্যক্তিরা জানেন।

আমি এক কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, আমি তো আপনাদের 'ভাসুর' না। আমার নাম মুখে নিতে সমস্যা কী ছিল ?

তিনি বললেন, আপনি খুব ভালোভাবেই অনুষ্ঠানে ছিলেন। পরে আপনাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

আমি বললাম, কেন ?

কর্তাব্যক্তি মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন। কিছু বললেন না।

বাদ পড়ার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রচুর আছে। সাহিত্যের অধ্যাপকদের অনেক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন

www.MurchOna.com

সাহিত্য। সেখানে সবাই আছে, আমি নেই। হতেই পারে সাহিত্যের অধ্যাপকরা আমাকে লেখক মনে করেন না। এমন একজন মনে করেন যে লেখালেখি করে অর্থ উপার্জন করেন। তাদের কাছে লেখালেখি করে অর্থ উপার্জন মানে সাহিত্যের মহান বোধের অবমাননা। এই নিয়ে আমি ঝামেলাতেও পড়েছি। উদাহরণ দেই—

এইসব দিনরাত্রি ধারাবাহিক নাটকটি প্রচার হবার পর এক সাংবাদিক জানতে চাইলেন, এই ধারাবাহিক নাটকটি লেখার পেছনে আপনার মূল প্রেরণা কী ছিল ?

আমি বললাম, অর্থ উপার্জন। আমার একটি রঙিন টিভি কেনার প্রয়োজন ছিল বলেই ধারাবাহিক নাটকটি লিখেছি।

সাক্ষাৎকার প্রচার হবার পরপরই এই নাটকে যারা অভিনয় করেছেন তারা আহত হলেন। বিশেষভাবে রাগলেন প্রয়াত অভিনেতা আবুল খায়ের। তিনি বললেন, আমরা এত আবেগ নিয়ে এই নাটকে অভিনয় করেছি, আর হুমায়ূন আহমেদ বলে দিলেন তিনি সামান্য একটা রঙিন টিভির জন্যে নাটক লিখেছেন!

অভিনেতাদের তপ্ত বক্তব্য পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল। বাধ্য হয়ে একদিন আমি আবুল খায়ের সাহেবকে ডেকে পাঠালাম। আমি বললাম, ভাই, আপনি যে অভিনয় করেছেন তার জন্যে কি বিটিভির কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ নিয়েছি।

আমি বললাম, আমিও ঠিক তাই করেছি। নাটক লেখার জন্যে টাকা নিয়েছি। আপনি হৈচৈ করছেন কেন ? একজন লেখক চাঁদের আলো খেয়ে বাঁচেন না। তাকে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট খেতে হয়।

আপনি কেন বললেন, রঙিন টিভি কেনার জন্যে নাটক লিখেছেন ?

যেটা সত্যি আমি তাই বলেছি। আপনাকে ডেকেছি রঙিন টিভিটা দেখার জন্য। নিজের চোখে দেখুন আমার বাচ্চারা কত আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখছে। বেতনের টাকা দিয়ে বাচ্চাদের এই টিভিটা কিনে দেবার সামর্থ্য আমার ছিল না।

আবুল খায়ের সাহেব খুব আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ আমার বাচ্চাদের সঙ্গে টিভি দেখলেন। একসময় তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ভুল করেছি। ক্ষমা চাই।

খায়ের ভাইয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহাল ছিল। নতুন কোনো নাটক বানাতে গেলেই আমার তাঁর কথা মনে পড়ে। খায়ের ভাইয়ের সমকক্ষ অভিনেতা বাংলাদেশে আছে বলে আমি মনে করি না।

www.MurchOna.com

বলপয়েন্টে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। এই ঘটনার পর এই ঘটনা ঘটল লিখে লেখকজীবনের ইতিহাস লেখায় আমি যাচ্ছি না। যখন যা মনে আসছে তাই লিখছি। সবচেয়ে বড় সমস্যা ডায়েরি লেখার অভ্যাস আমার নেই। চিঠিপত্র বা ফটোগ্রাফ জমানোর মধ্যেও নেই। আমার সমস্ত সঞ্চয়ই স্মৃতিতে।

আমার মৃত্যুর পর পত্রিকাওয়ালারা একটা সমস্যায় পড়বেন। 'হুমায়ূন আহমেদের ডায়েরি' বা 'অপ্রকাশিত জার্নাল' নামে কিছু ছাপাতে পারবেন না।

সাহিত্যের লাইনের গ্রান্ডমাস্টারদের কেউ কেউ আমাকে চিঠি লিখেছেন। সেইসব চিঠিও জমা করে রাখি নি। আমার মানসিকতায় নিঃসঙ্গতা ব্যাধি আছে। নিঃসঙ্গতা ব্যধিগ্রস্তরা তাদের পাশে কিছুই জমা করতে ভালোবাসে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে। উদাহরণ দেই।

ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র এসেছেন বাংলাদেশে। উঠেছেন সোনারগাঁও হোটেলে। কৈশোরে বিমল মিত্রের বিশাল বই *কড়ি দিয়ে কিনলাম* খাটের তলায় বসে পড়ে শেষ করেছি। ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবর্ষণ করেছি। সবার সামনে এই বই পড়ার উপায় ছিল না, কারণ Out book হিসেবে একজন কিশোরের কাছে সেই বই নিষিদ্ধ।

কড়ি দিয়ে কিনলাম, সাহেব বিবি গোলাম-এর বিমল মিত্র ঢাকায়— শুনেই ভালো লাগল। এক সন্ধ্যায় বিমল মিত্রের কাছ থেকে টেলিফোন, হুমায়ূন, আসো আমার সঙ্গে দেখা করে যাও।

আমার আনন্দিত হয়ে ছুটে যাওয়া দরকার ছিল। তা না করে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমি কারোর সঙ্গে দেখা করি না। আমি আসছি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

যত বিনয়ের সঙ্গেই কথাগুলি বলা হোক, বিমল মিত্রের কাছে তা সুখকর নিশ্চয়ই ছিল না। আমার কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা— লেখককে চিনব তাঁর লেখা দিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব লেখকের প্রতি আমার একধরনের বিরাগও ছিল। তারা পিঠ চাপড়ানো কথা বলতে

www.MurchOna.com

ভালোবাসেন। নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবেন। বাংলাদেশের লেখকদের জল-চল জাতের উপরে কিছু ভাবেন না।

এখনো যে সেই অবস্থার ইতরবিশেষ হয়েছে তা-না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম ঢাকায় আসার ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। চারদিকে ফিসফাস ভাব। সুনীল এসেছেন। পাঠকদের হাত থেকে তাঁকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। খবর পেলেই পাঠকরা প্রিয় লেখকের ওপর হামলে পড়বেন। তিনি কোথায় আছেন তা সম্পূর্ণ গোপন। যাদের সঙ্গে আছেন তারা মহাভাগ্যবান হিসেবে চিহ্নিত। তারা কিছু Exclusive পার্টির ব্যবস্থা করছেন। অতি ভাগ্যবানরা সেই পার্টিতে যাবার সুযোগ পাচ্ছেন।

আমি তেমন এক পার্টিতে যাবার সুযোগ পেলাম। জনৈক প্রকাশকের বাড়িতে পার্টি। আমাকে কয়েকবার টেলিফোনে জানানো হলো যেন একা যাই। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে যাই। এবং ঘটনাটা প্রচার না করি। প্রচার হয়ে গেলে জনতা সামলানো কঠিন হবে। ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথম দেখলাম। হাতে সিগারেট এবং হুইস্কির গ্লাস। আশেপাশে কী ঘটছে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন বলে মনে হলো না। তাঁর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় সুনীলের পাশে বসেন নি। তাঁর হাতে কোনো গ্লাস নেই। তাঁকে খানিকটা বিব্রত মনে হচ্ছে। ঘরে আলো কম। অন্য ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো হচ্ছে। কঠিন পরিবেশ যাকে বলে।

পার্টিতে নিমন্ত্রণপ্রাপ্তরা বেশিরভাগই লেখক। তাঁরা তাঁদের সব বই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। বই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। তিনি পাতা উল্টে পাশে রেখে দিচ্ছেন। সাহিত্য এবং কাব্য আলোচনা চলছে। এমন কৃত্রিম কথাবার্তা এবং আচরণ আমি আমার জীবনে কম দেখেছি। শুরু হলো ফটোসেশন। একেকজন লেখক যাচ্ছেন, নানান ভঙ্গিমায় ছবি তুলে ফিরছেন। মন ভরছে না। তিনি আবারো যাচ্ছেন।

গ্রহের চারপাশে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহদের ভেদ করে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পৌছতে পারলাম না। তাঁকে দেবার জন্যে আমি আমার একটা উপন্যাস নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা তাঁকে দেয়া হলো না। গোপনে ফেরত নিয়ে চলে এলাম।

আসরে ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের ব্যবহার একটু অদ্ভুত মনে হলো। সে দেখি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সমানে তুমি তুমি করে সম্বোধন করছে। সমরেশ মজুমদার একবার এলেন। মিলন তাঁকেও দেখি 'তুমি' করে বলছে। একদিন মিলনকে বললাম, এঁরা বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়। তুমি অবলীলায় তাঁদের তুমি বলছ কীভাবে?

www.MurchOna.com

মিলনের উত্তর শুনে আনন্দ পেলাম। সে বলল, হুমায়ূন ভাই, এঁরা বাংলাদেশে এসে সবাইকে তুমি তুমি করেন। কাজেই আমিও করি। সম্বোধনে সমান সমান।

আমার সমস্যা হচ্ছে আমি কাউকেই তুমি করে বলতে পারি না। তুমি তুমি বলার বন্ধু আমার নেই। সবার সঙ্গেই ফর্মাল সম্পর্ক। একদিন শাওন বলল, তোমার যে কোনো বন্ধু নেই এটা কি তুমি জানো? তোমার পরিচিতজন আছে, বন্ধু নেই। তুমি অতি নিঃসঙ্গ মানুষদের একজন।

আমি চিন্তা করে দেখলাম ঘটনা তো সেরকমই। বন্ধু নেই একজন মানুষ বাঁচে কীভাবে? আমি তো ভালো আছি এবং সুখেই আছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করেই রহস্যের সমাধান বের করলাম (আমি আবার মিসির আলি তো)। আমার মাথায় সবসময় গল্প কিংবা উপন্যাস থাকে। গল্প-উপন্যাস যখন যেটা লিখছি তার চরিত্রই বন্ধু হিসেবে থাকে। বাইরের বন্ধুর প্রয়োজন সে কারণেই হয় না।

ইমদাদুল হক মিলনের কাছে ফিরে যাই। তার সঙ্গে প্রথম দেখা বইমেলায়। আমেরিকা থেকে ফেরার পর প্রথম বইমেলায় গিয়েছি। একটা স্টলের সামনে ভিড়। লেখকের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেয়া হচ্ছে। লেখক দাঁড়িয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। তার পরনে জিন্সের প্যান্ট। মাথা সম্ভবত কামানো। লেখকের চেহারা মোটেই লেখকসুলভ নয়। দেখাচ্ছে পাড়ার মাস্তানদের মতো। আমি এই লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচিত নই। নামের সঙ্গেও না। আমি তার একটা বই কিনলাম (*ও রাধা ও কৃষ্ণ*) এবং লাইনে দাঁড়ালাম অটোগ্রাফের জন্যে। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে একবারই কারো কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছি।

মিলন খুব সম্ভব নিজেকে প্রেমের উপন্যাসের লেখক হিসেবে পরিচিত করতে চেয়েছিল। কম বয়সের জনপ্রিয়তার এই একটা সমস্যা। লেখক পাঠকদের চাহিদার কাছে নতজানু হন। মিলনের লেখার ক্ষমতার বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হবার ব্যবস্থা সে করে রেখেছে, তারপরেও তার ক্ষমতার ভুল ব্যবহার দেখে অনেকবার ব্যথিত হয়েছি।

ওয়ার্ড কমিশনাররা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেন। আমি ওয়ার্ড কমিশনারের মতো মিলনকে একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছি—

যার জন্যে প্রযোজ্য

লেখক ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। সে অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী। ঘরোয়া আড্ডায় কখনো তাকে উত্তেজিত হতে দেখে নি। বাংলা সাহিত্যের পড়াশোনা তার ব্যাপক। বাংলা ভাষায় এমন কোনো বই লেখা হয় নি যা

www.MurchOna.com

সে পড়ে নি। তার চরিত্রে জল-স্বভাব প্রবল। যে-কোনো পাত্রেই তাকে রাখা যায়। রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে সে জড়িত না। আমি তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

সার্টিফিকেট প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন আমি নিজে একটা সার্টিফিকেট যে পেয়েছিলাম সেই গল্পটা বলি। একদিন এক যুবক ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে বলল, তার হাতের লেখা অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো। সে কিছু নমুনাও নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, *দেশ* পত্রিকার সাগরময় ঘোষ তোমাকে পেলে লুফে নিতেন। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করতেন।

আমি তাকে দিয়ে নিজের জন্যে রবীন্দ্রনাথের একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলাম। সেখানে লেখা—

শ্রীমান হুমায়ূন আহমেদ,

তোমার কিছু রচনা পাঠ করিয়া বিমলানন্দ পাইয়াছি। তোমার কিছু শব্দের বানান বিষয়ে আমার কথা আছে। সাক্ষাতে বলিব।

ইতি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.MurchOna.com

নামের আগে ড. লাগিয়ে বসে আছি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। কিন্তু সংসার চালিয়ে নিতে পারছি না। 'পত্রিকায় পড়ার মতো কোনো খবর নেই'— এই অজুহাত দেখিয়ে বাসায় পত্রিকা রাখাও বন্ধ। আমেরিকায় গুলতেকিন নানান কাজকর্ম করে কিছু রোজগার করত। বাংলাদেশে সেই রোজগারও বন্ধ। সে কোথাও যে চাকরি নেবে তাও সম্ভব না। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। S.S.C পাশের পর বিয়ে হয়েছে। আমেরিকায় তাকে পড়াশোনা করানো সম্ভব হয় নি। [তবে সে দেশে ফিরে পড়াশোনা শুরু করেছিল এবং আমাকে অবাক করে দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রি নিয়েছিল।]

আগের কথায় ফিরে যাই। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। কী করা যায় বুঝতে পারছি না। একদিন শুনলাম সেবা প্রকাশনীর আনোয়ার হোসেন সাহেবকে বই অনুবাদ করে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নগদ টাকা দেন। গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমার হাতে একটা ইংরেজি বই ধরিয়ে দিয়ে বললেন, অনুবাদ করে নিয়ে আসুন। পড়ে দেখি কেমন হয়েছে। ভালো হলে ছাপব। নগদ টাকা দেব। বইটার নাম Man on fire.

সাতদিনের মাথায় অনুবাদ শেষ করে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলাম। বইটার নাম দিলাম *অমানুষ*। আমার ধারণা ছিল অনুবাদ পড়লে এই বই তিনি ছাপবেন না। কারণ আমি মূল উপন্যাসের কাঠামো ঠিক রেখে সম্পূর্ণই আমার মতো করে লিখেছি। বাঙালি এক যুবকের গল্প, যার নাম জামশেদ। আনোয়ার হোসেন সাহেব পাণ্ডুলিপি না পড়েই সেদিন আমাকে তিনশ' টাকা দিলেন। সেবা প্রকাশনীর জন্যে আমি আরো দু'টা বই অনুবাদ করেছি। একটির নাম *সম্রাট*, আরেকটির নাম *দ্যা এক্সোরসিস্ট*। ভূতের গল্প। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্যে লেখালেখি করাকে অনেকেই ছোট চোখে দেখেন। আমি অর্থ উপার্জনের জন্যে বই অনুবাদ করেছি। এই সত্য প্রকাশে কোনোরকম লজ্জা বোধ করছি না।

আমার ভাগ্য খানিকটা বদলালো, শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গেলাম। হাউস টিউটর মানে ফ্রি বাসা। ফ্রি ইলেকট্রিসিটি, ফ্রি গ্যাস ও পানি। আমি মহানন্দে শহীদুল্লাহ হলের গেটে সংসার পাতলাম। হলের গেটের দু'পাশে দুই হাউস টিউটরের বাসা। তাঁরা এক অর্থে হলের গেটকিপার। হলের

www.MurchOna.com

ভেতরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তাঁরাই প্রথম জানবেন।

ঢাকা শহরের সুন্দর কিছু জায়গার একটি শহীদুল্লাহ্ হল। হলের সামনে প্রাচীন কিছু বৃক্ষ। সেখানে বাস করে রাজ্যের টিয়া পাখি। একসঙ্গে এত টিয়াপাখির বাস বাংলাদেশে আর কোথাও আছে বলে আমি জানি না। সন্ধ্যাবেলা সব পাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি করে চারপাশ রহস্যময় করে তোলে।

হলের পাশের বিশাল দিঘিটাও রহস্যময়। প্রতিবছরই সেই দিঘিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে কেউ-না-কেউ মারা যায়। দিঘির পাড়ে 'সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ' সাইনবোর্ডও লাগানো আছে। দিঘির পানি কাঁচের চেয়েও পরিষ্কার।

রহস্যময় এই দিঘিতে সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ জেনেও আমি আমার তিন মেয়েকে এই দিঘিতেই সাঁতার কাটা শিখিয়েছি। অনেক পূর্ণিমার রাতে দিঘির জলে সপরিবারে নেমেছি। একই সঙ্গে জলস্নান এবং চন্দ্রস্নান।

আমার তিন মেয়ে শহীদুল্লাহ্ হলের দিঘিতে শুধু যে সাঁতার শিখেছে তা না, তারা হলের সামনের মাঠে সাইকেল চালাতেও শিখেছে। ট্রেইনার আমি। বড় মেয়ে নোভা প্রথম যেদিন সাইকেল চালানো শিখল, সেই দিনের দৃশ্য আমার এখনো চোখে ভাসে। সে প্যাডেল করছে। আমি সাইকেলের পেছনটা ধরে আছি। সে একটু পরপর বলছে— ড্যাডি, আমাকে ছেড়ে দিও না। ছেড়ে দিলেই আমি পড়ে যাব। আমি বললাম, মা, আমি শক্ত করে ধরে আছি। ছাড়ব না। তুমি এক চক্কর ঘুরে আস।... আমি ততক্ষণে সাইকেল ছেড়ে দিয়েছি। নোভা যে একা একা যাচ্ছে তা সে জানে না। পুরো চক্কর দিয়ে এসে হঠাৎ সে আমাকে দেখল— আমি সিগারেট টানছি। নোভা বিকট চিৎকার দিল, বাবা, আমি সাইকেল চালানো শিখে গেছি। বলেই সে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

আমার মেয়েদের যদি কখনো জিজ্ঞেস করা হয়— বাবার বিষয়ে তোমাদের সবচেয়ে সুখের স্মৃতি কী?— তারা অবশ্যই সাঁতার শেখা এবং সাইকেল চালানো শেখার কথা বলবে।

আমি মেয়েদের পেছনে কোনো সময়ই দিতে পারি নি। ইউনিভার্সিটির চাপ, হলের চাপ, লেখালেখিতেই সময় চলে যেত। তখন আমার দু'জন থিসিসের ছাত্র ছিল। তাদের রিসার্চের কাজ দেখাশোনাতেও প্রচুর সময় যেত। ইউনিভার্সিটির ছুটির দিনে সন্ধ্যার পর কিছু অবসর পেতাম। তখন চলে যেতাম ইউনিভার্সিটি ক্লাবে দাবা খেলতে। দাবা খেলতাম রাজ্জাক স্যারের সঙ্গে (হ্যারাল্ড লাস্কির প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। কিংবদন্তি শিক্ষক)। দাবা খেলার সময়টা আমি আমার পরিবারকে দিতে পারতাম। তাও দেই নি। কারো বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, জন্মদিন, বিয়ে— এইসবে আমি নেই। সম্পূর্ণই নিজের ভেতরে বাস করা।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

সবকিছু দেখেশুনেই হয়তো আমার মেয়েরা আবদারশূন্য মানসিকতায় বড় হতে লাগল। তারা কেউ কখনো আমার কাছে কিছু চেয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি না। মেয়েদের কাছে আমি ছিলাম ভিনগ্রহের মানুষ। তারা আমার চোখের সামনে বড় হচ্ছে, এই পর্যন্তই। তাদের জন্যে আদর নেই, বকাও নেই। তারপরেও কী কারণে যেন বড় মেয়ে নোভার ওপর রাগ করে তার গালে একটা চড় দিয়ে বসলাম। মেয়ে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাসও করতে পারছে না আমি এমন একটা কাজ করতে পারি।

আমি বললাম, মা, আমি খুবই ভুল একটা কাজ করেছি। বুঝতে পারছি তুমি মনে কষ্ট পেয়েছ। বলো কী করলে তোমার মনের কষ্ট দূর হবে। আমি তাই করব।

নোভা বলল, বাথরুমে একটা বাথটাব বসিয়ে দাও। বাথটাবে গোসল করলে মনের কষ্ট কমবে।

আমি বাথটাবের ব্যবস্থা করলাম।

কয়েকদিন আগে কবি নির্মলেন্দু গুণের মেয়ে মৃত্তিকার সঙ্গে দেখা। সে বলল, আঙ্কেল, আপনার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় আমি কী করতাম আপনার মনে আছে?

কী করতে?

বাবার সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। যে কাপড় পরে যেতাম সেই কাপড়েই লাফ দিয়ে আপনাদের বাথটাবে নেমে পড়তাম।

শহীদুল্লাহ হলে থাকার সময়ই 'অনিন্দ্য প্রকাশনী'র মালিক আমাকে আমার বইয়ের রয়েলটির টাকা না দিয়ে সেই টাকায় একটা গাড়ি কিনে দিলেন। গাড়ির সঙ্গে একজন ড্রাইভার দিয়ে দিলেন।

নতুন গাড়ি দেখে আমার মেয়েদের সে-কী লাফালাফি! সে-কী চিৎকার! মেজো মেয়ে শীলা তার বান্ধবীকে টেলিফোন করে বলল, বাবা না আমাদের জন্যে একটা গাড়ি কিনেছে। গাড়ির সঙ্গে একজন ড্রাইভার কিনে এনেছে।

একটা গাড়িই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি রয়েলটির টাকা পেয়ে আরেকটা মাইক্রোবাস কিনে ফেললাম। ব্যাংকে কোনো জমা টাকা নেই, অথচ শহীদুল্লাহ হলের বাসার সামনে দু'টা গাড়ি। মেয়েরা বান্ধবীদের নিয়ে মাইক্রোবাসে বসে রান্নাবাটি খেলা খেলে।

দ্বিতীয় গাড়ি কেনার মানসিকতাটা ব্যাখ্যা করি। রয়েলটির টাকা হাতে নিতে বা জমা করে রাখতে আমার লজ্জা লাগত। আমার মনে হতো এটা ঠিক না। কেন বই লিখে এত টাকা পাব! এই কারণেই যা পেতাম সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে ফেলতাম।

শহীদুল্লাহ হল নিয়ে আমার অসংখ্য সুখস্মৃতি আছে। একটা সুখস্মৃতি বলি।

www.MurchOna.com

আমি একটা বিষয়ে (টাকা চুরি) কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে হলের একটি ছাত্রকে হল থেকে বের করে দেবার সুপারিশ করেছি। সে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্তাব্যক্তি। সংগঠন তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল এবং মিছিল বের করল।

মিছিলের স্লোগান— 'হুমায়ূন আহমেদের চামড়া তুলে নেব আমরা।' আমি মন খারাপ করে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শুনি আমার তিন মেয়ে এবং তাদের এক বান্ধবী (ফ্ল্যাটের হাউস টিউটর সাহেবের মেয়ে) পাল্টা স্লোগান দিচ্ছে—

হুমায়ূন আহমেদের চামড়া
লাগিয়ে দেব আমরা।

আনন্দে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল।

এবার দুঃখস্মৃতির কথা বলি।

রাত আটটা। হঠাৎ গেটের সব বাতি নিভে গেল। আমি ভয়াবহ আর্তচিৎকার শুনলাম, স্যার, আমাকে মেরে ফেলছে। আমাকে বাঁচান।

আমি বারান্দায় এসে দেখি তিনজন মিলে একটা ছেলেকে গেটের সামনে চেপে ধরেছে। অন্য একজন তার শরীরে ছুরি বসাচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে।

আমার খালি গা। পরনে লুঙ্গি। এই অবস্থায় দৌড়ে নিচে নামলাম। দ্বিতীয় কেউ এগিয়ে এল না। অথচ হলভর্তি ছাত্র। অনেক দারোয়ান। অনেক হাউস টিউটর।

যারা ছুরি মারছিল তারা আমাকে দেখে থমকে গেল। আমার একবারও মনে হলো না এরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। আমি পাগলের মতো এদের ধরার জন্যে ছুটছি। তারা পুকুরের দিকে যাচ্ছে। আমি ছুটছি তাদের পেছনে। এমন সময় আমার পাশের হাউস টিউটর চেঁচিয়ে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, কী করছেন ? ফিরে আসেন।

আমার সংবিত ফিরল। আমি আহত ছেলেটির কাছে এলাম। গেটের অন্য পাশের হাউস টিউটর সাহেবকে নিয়ে ছেলেটিকে ধরাধরি করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

রক্তে আমার সারা শরীর ভিজে গেল। এই প্রথম রক্তস্নান করলাম।

যাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, সে নিজেও ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী। তার দল খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে তাকে নিয়ে গেল। সে বেঁচে ছিল না মারা গিয়েছিল কিছুই জানি না।

শহীদুল্লাহ্ হলে আমি অনেক লেখা লিখেছি। কয়েকটার নাম দিলাম— *আমার আছে জল*। *জনম জনম*। *সাজঘর*। *পুতুল*। চারটা নাম দিলাম, কারণ এই চারটাই বিভিন্ন পরিচালক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

www.MurchOna.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক সম্ভবত সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেন নি, চিরকুমার মানুষ। সবসময় পায়জামা এবং গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরতেন। খুব কম কথা বলতেন, তবে অতি ঘনিষ্ঠদের কাছে মজলিশি মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চেহারার সঙ্গে হো চি মিনের চেহারার সাদৃশ্য ছিল। তিনি নিয়ম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে যেতেন। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবা খেলতেন। অস্থিরতা নামক বিষয়টি তাঁর মধ্যে কখনো দেখি নি, তবে দাবা খেলার শেষের দিকে (যখন জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে) কিছু অস্থিরতা দেখা যেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাধর মানুষদের উনি ছিলেন একজন। তাঁর ক্ষমতার উৎস আমি জানতাম না। শুনেছি তিনি হ্যারল্ড লাস্কি নামক জগৎবিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে Ph.D করছিলেন। থিসিস লেখার শেষ পর্যায়ে হ্যারল্ড লাস্কি মারা যান। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক থিসিস জমা না দিয়েই দেশে ফিরে আসেন। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল, হ্যারল্ড লাস্কি ছাড়া এই থিসিসের মর্ম কেউ বুঝবে না।

আমি হ্যারল্ড লাস্কিকে চিনি না। কেন তিনি জগৎবিখ্যাত তাও জানি না। আমি তাঁর ছাত্রের প্রতি সবার সমীহ দেখে অবাক হই। এমন না যে অধ্যাপক রাজ্জাক অনেক বইপত্র লিখে নিজেকে বিকশিত করেছেন। আমার মনে হয় তিনি তাঁর প্রতিভার পুরোটাই দাবা খেলায় ব্যয় করেছেন। সেখানেও তেমন কিছু করতে পারেন নি। বেশির ভাগ সময়ই অন্যদের কাছে হেরেছেন। আমি অতি নিম্নমানের দাবা খেলোয়াড়। তিনি আমার কাছেও মাঝে মধ্যে হারতেন। চাল ফেরত নেয়া দাবা খেলায় নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কাজটি সবসময়ই করতেন।

অধ্যাপক রাজ্জাককে নিয়ে মাতামাতি শুধু যে দেশেই তা-না, বিদেশেও। দেশের বাইরের অনেকেই তাঁর পরামর্শে তাঁর অধীনে Ph.D করেছেন। অনেক গবেষণাপত্র উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁর নামে। এক বাঙালি অর্থনীতিবিদ ঢাকায় এলেই রাজ্জাক স্যারের বাসায় যেতেন। তিনি কয়েকবার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবেও নিয়ে এসেছেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন— "এই ছেলে Economics ভালো জানে।"

www.MurchOna.com

Economics জানা মানুষটির নাম অমর্ত্য সেন। যিনি পরে ইকনমিক্সে নোবেল পুরস্কার পান।

প্রস্তাবনাপর্ব শেষ, এখন মূল গল্পে আসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তখন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শামসুল হক। তিনি আমাকে অফিসে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, একটা কাজ করে দিতে হবে। আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের একটি ইংরেজি বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করে দিতে হবে। উনি বিশেষ করে আপনার কথা বলেছেন।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক আমার নাম জানেন, এতেই আমি যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা অনুভব করলাম। কারণ তখনো তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তাঁর সঙ্গে দাবা খেলারও শুরু হয় নি।

আমি বললাম, স্যার, আমি অবশ্যই অনুবাদ করে দেব।

ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মূল বক্তৃতাটা রাজ্জাক সাহেবের। আশা করি গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। হুবহু অনুবাদ করবেন। একচুলও যেন এদিক-ওদিক না হয়।

স্যার, আপনি নিশ্চিত থাকুন। হুবহু অনুবাদ করব।

শহীদুল্লাহ হলে রাজ্জাক সাহেবের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ফিরেই অনুবাদে হাত দিয়েছি। একটা জায়গায় এসে থমকে গেলাম। এইসব কী লিখেছেন ?

স্যার লিখছেন— শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিখ্যাত সব শিক্ষকের মিলনক্ষেত্র। অতি বিখ্যাত সব শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু গুণী কোনো ছাত্র বের করতে পারে নি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৌলুশ কমে গেল। মোটামুটি মানের শিক্ষকরা শিক্ষকতা শুরু করলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন অসাধারণ মেধার মানুষ বের করতে শুরু করল। যেমন, কবি শামসুর রাহমান, ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ।

আমি ভেবেই পাচ্ছি না, যে হুমায়ূন আহমেদের কথা লেখা হচ্ছে সে কি আমি ? আরো কোনো হুমায়ূন আহমেদ কি আছে ? যদি আমি সেই হুমায়ূন আহমেদ হয়ে থাকি, তাহলে তো আমার এই লেখা অনুবাদ করা ঠিক হবে না।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে বললেন— আপনার নামই তো মনে হচ্ছে। আপনি এক কাজ করুন— রাজ্জাক সাহেবের কাছে যান, তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করুন। উনি ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে থাকেন। একা মানুষ। এখনি চলে যান।

আমি স্যারের বাসায় গেলাম। তার বসার ঘরটা প্রকাণ্ড। সেখানে কোনো সোফা নেই। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মশারি খাটানো। স্যার মশারির

www.MurchOna.com

ভেতর চেয়ার-টেবিল পেতে পড়াশোনা করছেন। মশার হাত থেকে মুক্ত থেকে পড়াশোনা করার চমৎকার ব্যবস্থা। স্যার আমাকে দেখে মশারির ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। আমি আমার সমস্যার কথা বললাম।

স্যার বললেন, আমি আপনার কথাই লিখেছি এবং কোনো ভুল করি নি। যেভাবে লিখেছি সেভাবেই যেন অনুবাদ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে খুব আগ্রহ করে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি। প্যান্ডেল সাজিয়ে বিশাল আয়োজন। স্যার বক্তৃতা শেষ করলেন। তুমুল করতালি। আমি ভ্যাবদা মেরে বসে আছি, কারণ বক্তৃতায় হুমায়ূন আহমেদের অংশটা নেই। স্যার যে পড়তে ভুলে গেছেন তাও না। মূল বক্তৃতা বুকলেট আকারে সবাইকে দেয়া হয়েছে। সেখানেও এই অংশ নেই।

খুবই তুচ্ছ বিষয়। মাঝে মাঝে তুচ্ছ বিষয় চোরাকাঁটার মতো মনে লেগে থাকে। ব্যথা দেয় না, অস্বস্তি দেয়।

কয়েকদিন পর রাজ্জাক স্যার পিয়ন পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাতে তাঁর বাসায় খাবার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। বিশাল আয়োজন। অনেক অতিথি। সবাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু নামগোত্রহীন। হংস মধ্যে 'কাক' যথা, বকও না। স্যার এক ফাঁকে বললেন, আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?

আমি বললাম, জি-না স্যার।

স্যার বললেন, বক্তৃতার অনুবাদ ভালো হয়েছে। বক্তৃতা বিষয়ে কিছু বলবেন?

আমি বললাম, জি-না।

সবাই খেতে বসেছি। স্যার আমাকে বসিয়েছেন তাঁর পাশে। প্রচুর খাবার-দাবার। এর মধ্যে একটি আইটেম স্যারের রান্না করা। উনি খেতে পছন্দ করতেন। রান্নার ব্যাপারেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। খাবার টেবিলে আরেকটি ব্যাপার আমাকে বিস্মিত করল। সবাইকে ফ্রান্সের তৈরি চিনামাটির বাসনে খেতে দেয়া হয়েছে, আর স্যার খাচ্ছেন মাটির সানকিতে। উনি না-কি মাটির সানকি ছাড়া খেতে পারেন না।

স্যারের দাওয়াতে আমি নিয়মিত হয়ে গেলাম, কিছুদিন পরপরই আমার ডাক পড়ে। আমি সামাজিক মানুষ না। অচেনা সব লোকজনের ভিড়ে অস্বস্তি বোধ করি। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে কেউ এগিয়েও আসে না। নিজেকে মনে হয় গৃহকর্তার দরিদ্র আত্মীয়, যাকে আসর থেকে বাদ দেয়া যায় না, আবার আসরে রাখাও যায় না।

www.MurchOna.com

উপগ্রহ আমার খুব অপছন্দের জিনিস। স্যারের কাছে আমার অবস্থান ছিল উপগ্রহের মতো।

তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। খবর পেয়ে আমি *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক জনাব সালেহ চৌধুরীকে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি বই পড়ছেন। বইটির নাম *অমানুষ*। লেখক হুমায়ূন আহমেদ।

সালেহ চৌধুরী বললেন, স্যার, কেমন আছেন ?

তিনি বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, পরে আসুন। এখন ব্যস্ত আছি। বই পড়ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের ঘটনায় খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। সেদিনের ঘটনায় সব দুঃখ ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল।

১৯৭১ নামের উপন্যাসটি আমি উৎসর্গ করেছিলাম স্যারের নামে। বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি পাতা উল্টে বললেন— যে বইয়ের নাম ১৯৭১, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র সত্তুর ?

আমি জবাব দিলাম না। তাঁর ঠিক এক সপ্তাহ পর তিনি আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠালেন। সরাসরি ঢুকে গেলাম তাঁর পড়ার টেবিলের ওপর ঝুলানো মশারির ভেতর। স্যার বললেন, নিজের হাতে খাঁটি ঘি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছি। খাবেন ?

আমি বললাম, জি-না স্যার।

আপনাকে ছোট্ট একটা উপদেশ দেবার জন্যে ডেকেছি। আপনাকে লেখালেখি নিয়ে অনেকেই অনেক উপদেশ দিতে চেষ্টা করবে। আপনি কোনো উপদেশই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন না। আপনার যা মনে আসে লিখবেন। ঠিক আছে ?

আমি বললাম, জি স্যার।

রাজ্জাক স্যারের মতো একই উপদেশ একটু ভিন্ন ভাষায় আরেকজন আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই গল্প আরেকদিন বলা যাবে।

পাদটিকা : শামসুর রাহমান এবং হুমায়ূন আহমেদের নাম কেন বাদ দেয়া হয়েছিল তা কখনো জানা হয় নি।

www.MurchOna.com

একটু পেছনে ফিরি।

১৯৬৫ সন। আমি পড়ি ঢাকা কলেজে। এখনকার ছেলেপুলেরা বলে 'ইন্টার'। সেই ইন্টারের ছাত্র। থাকি হোস্টেলে। প্রচুর স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা ভোগ করার উপায় নেই। কারণ আমার মামাও হোস্টেলে একই রুমে আমার সঙ্গে থাকেন। তিনি সিরিয়াস ধরনের ছাত্র। কোনো ক্লাস মিস করেন না। সন্ধ্যার পর পরই বই নিয়ে বসেন।

আমার ক্লাস করতে ভালো লাগে না। পাঠ্যবই পড়তে ভালো লাগে না। হোস্টেলের খাবার ভালো লাগে না। ঢাকায় থাকতে ভালো লাগে না।

ক্লাস করা প্রায় ছেড়েই দিলাম। আমার মামা তা টের পেলেন না। কারণ তিনি অন্য সেকশানের ছাত্র। ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দেয়ার শুরুটা বেশ মজার। বাংলার একজন শিক্ষক, নাম আজিজুর রহমান। তিনি ক্লাস নিতে এসে বললেন, অনেক ছেলেই ক্লাসে আসে শুধুমাত্র পার্সেন্টেজের জন্যে। তাদেরকে জানাচ্ছি, তারা ক্লাসে না এলেও চলবে। আমি সবাইকে পার্সেন্টেজ দেই।

আমি উঠে দাড়ালাম। স্যার বললেন, কিছু বলবে?

আমি বললাম, জি-না স্যার। আমি চলে যাব।

স্যার বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি গটগট করে বের হয়ে এলাম। পরে জানলাম আজিজুর রহমানই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান। তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি করেছি ভেবে মন খারাপ হলো এবং ঠিক করলাম অন্যক্লাস না করলেও আমি তাঁর ক্লাসগুলি করব।

শওকত ওসমান স্যারের ক্লাস করতে গিয়ে হতাশই হয়েছি। মূল বিষয় নিয়ে তিনি অল্পই কথা বলতেন। যেমন, একদিন পুরো ক্লাসে বললেন— তিনি একটা পেইন্টিং কিনেছেন সে-গল্প। একজন শিক্ষকের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্যারের কথা জড়িয়ে যেত। এবং আমার সবসময় মনে হতো তিনি সময় কাটানোর জন্যেই কথা বলছেন।

আমাদের আরেকজন বাংলার শিক্ষক ছিলেন। মোটা, বেঁটে। তাঁর নাম মনে পড়ছে না। তিনি ক্লাসে ঢুকেই নানান ধরনের জোকারি করতেন। অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিচিত্র শব্দ করতেন। ছাত্ররা খুবই মজা পেত। ক্লাস শেষ হবার পর

www.MurchOna.com

বলতেন, একটা ঘণ্টা আনন্দ করে পার করেছ এটাই লাভ। জগতে আনন্দই সত্য।

স্যারের গোপাল ভাঁড়ের মতো আচরণ আমার অসহ্য লাগত। একজন শিক্ষক ক্লাসে ছাত্র পড়াবেন। তাদের হাসানোর দায়িত্ব নেবেন না।

একদিন স্যার বললেন, কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্যার বললেন, কী জানতে চাও হে খোকা?

খোকা ডাকায় ক্লাসে হো হো হাসি শুরু হলো। হাসির শব্দ থামার পর আমি বললাম, স্যার, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে। নিউক্লিয়াস কি স্থির হয়ে থাকে? না-কি সেও ঘোরে?

স্যার কিছুক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় কাটালেন। তারপর বললেন, বাংলা ক্লাসে তুমি সায়েন্স নিয়ে এসেছ কেন? বাংলা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে কর।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, স্যার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাশুড়ির নাম জানতে চাচ্ছিলাম।

স্যার একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাকিয়ে আছি। ছাত্ররা হো হো হাসতে শুরু করেছে।

আমি মোটেই বেয়াদব ছাত্র না। বরং একটু বেশিরকমই বিনয়ী। কিন্তু শিক্ষকদের ফাঁকিবাজিটা কখনোই নিতে পারতাম না।

ঢাকা কলেজে ভালো শিক্ষক কি ছিলেন না?

অনেক ছিলেন। সিরাজুল হক নামের একজন অংকের শিক্ষক ছিলেন, তিনি পড়াতেন কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। ওরকম শিক্ষক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রফেসর নোমান পড়াতেন ইংরেজি কবিতা। কী সুন্দর কণ্ঠ! কী চমৎকার পড়ানোর ভঙ্গি!

শিক্ষকদের কথা থাকুক, তাঁদের ছাত্রের কথা বলি। ছাত্র ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কী করত? হন্টন করত।

হ্যাঁ, আমার প্রধান কাজ ছিল ঢাকা শহর চষে বেড়ানো। মাঝে মাঝে বলাকা সিনেমাহলে ম্যাটিনি শোতে ইংরেজি ছবি দেখা। দেশের প্রধান তখন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান। ছাত্রদের প্রতি তাঁর অনেক মমতা (!), ছাত্ররা যেন অর্ধেক টাকায় ছবি দেখতে পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। ছাত্রদের জন্যে সিনেমাহলে টিকিটের দাম অর্ধেক। ছাত্রদের সস্তায় সিনেমা দেখানোর জন্যে এই রাষ্ট্রপ্রধানের এত আগ্রহের কারণ কী কে জানে!

ঢাকার পথেঘাটে হাঁটতে হাঁটতে একবার এক ম্যাজিশিয়ানের দেখা পেলাম। বেশির ভাগ সময়ই ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখাবার পর ওষুধ বিক্রি করে। এই ম্যাজিশিয়ান সেরকম না। তিনি ম্যাজিকের কৌশল টাকার বিনিময়ে শিখিয়ে

www.MurchOna.com

দেন। কেউ যদি সেই আইটেম কিনতে চায় তাও তিনি বিক্রি করেন। আমি তার ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ। চারটা তাশ নিয়েছেন। চার বিবি। ফুঁ দেয়া মাত্র বিবিদের ছবি মুছে গেল। হয়ে গেল চারটা টেক্কা।

এই ম্যাজিকটার দাম পাঁচ টাকা। আমি পাঁচ টাকা দিয়ে ম্যাজিকটা কিনলাম। ম্যাজিশিয়ান আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কৌশল ব্যাখ্যা করলেন এবং চারটা তাশ আমাকে দিয়ে দিলেন।

ম্যাজিকের কৌশল শেখার পর সবারই ধাক্কার মতো লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়। কৌশল এত সহজ! আমি মুগ্ধ হলাম। মানুষকে এত সহজে বিভ্রান্ত করা যায়।

এরপর থেকে আমার কাজ হয়ে দাঁড়াল ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ম্যাজিক দেখা এবং অতি সস্তায় কিছু ম্যাজিক তার কাছ থেকে কেনা। কারণ টাকা নেই। নাশতা খাবার জন্যে যে টাকা বাবা পাঠান, তার একটা বড় অংশই এখন চলে যাচ্ছে ম্যাজিকের কৌশল কেনায়। সারাক্ষণ মনে হয় যদি প্রচুর টাকা থাকত, তাহলে এই লোকটার সব ম্যাজিক আমি কিনে নিতাম।

ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে আমার কিছুটা খাতিরও হলো। ভদ্রলোকের নাম মনে নেই, তবে তার ওস্তাদের নাম মনে আছে। ওস্তাদের নাম যদু বাবু। ম্যাজিশিয়ান কথায় কথায় যদু বাবুর প্রসঙ্গ আনতেন। যেমন—

'আমার ওস্তাদ যদু বাবু বলতেন যারা ম্যাজিকের জিনিসপত্র দিয়ে ম্যাজিক দেখায়, তারা ম্যাজিশিয়ান সমাজের কলঙ্ক। হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে যারা খেলা দেখায় তারাই খেলোয়াড়।'

আমি ম্যাজিশিয়ানকে একদিন বললাম, পামিং শিখতে চাই। কতদিন লাগবে?

তিনি বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, কমের পক্ষে কুড়ি বছর। প্রথম দশ বছর পয়সা হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে।

হাতে নিয়ে ঘুরলেই হবে, আর কিছু না?

না। দশ বছরে পয়সা হাতরে চিনবে, হাত পয়সারে চিনবে। দুইজনের ভিতর মহব্বত হবে।

আমি কয়েন হাতে নিয়ে ঘুরতে শুরু করলাম। সবসময় হাতে কয়েন। কখনো একটা। কখনো দু'টা।

ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক থাকেন চানখাঁর পুলে। মাঝে মধ্যে তার ছাপড়ায় বেড়াতে যাই। তিনি আমাকে দেখে খুশিও হন না, বিরক্তও হন না। মন ভালো থাকলে এক-আধটা ম্যাজিক দেখান। একদিনের কথা। উনার মেজাজ খুব ভালো। আমাকে দেখেই বললেন, এখান থেকে যে-কোনো একটা তাশ নাও।

www.MurchOna.com

আমি নিলাম হার্টসের দুই।

ম্যাজিশিয়ান হাই তুলতে তুলতে বললেন, পানির গ্লাসের ভিতর তাকিয়ে দেখ কিছু দেখা যায় কি-না।

আমি অবাক হয়ে দেখি, পানির গ্লাসে হার্টসের দুই-এর ছায়া। আমি মন্ত্রমুগ্ধ। ম্যাজিশিয়ান বললেন, আমি শিষ্য নেই না। শিষ্য নিলে তোমারে নিতাম। তবে যদি পার আমাকে তিনশ' টাকা দিও। এমন একটা ম্যাজিক তোমাকে শিখায়ে দিব বাকি জীবন করে খেতে পারবে।

তিনশ' টাকা তখন অনেক টাকা। হোস্টেলের ফুড চার্জ মাসে চল্লিশ টাকা। ষাট টাকায় আমার মাস চলে। সেখানে কোথায় পাব তিনশ' টাকা?

একসময় ছয় মাসের স্কলারশিপের টাকা একসঙ্গে পেলাম। প্রায় একহাজার টাকা। সেখান থেকে তিনশ' টাকা নিয়ে গেলাম ম্যাজিশিয়ানের কাছে। তিনি তিনশ' টাকা রেখে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে যেতে বললেন। আমি গেলাম এবং শুনলাম ম্যাজিশিয়ান ছাপড়া ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

পাঠকের ধারণা হতে পারে এই ঘটনার পর আমি ম্যাজিকচর্চা ছেড়ে দিয়েছি। তা কিন্তু হয় নি। পামিং শেখা চালিয়ে গেছি। ম্যাজিকের বইপত্র জোগাড় করেছি। যে যা জানে তার কাছেই শেখার চেষ্টা করেছি।

যে মানুষটি এই ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন, তাঁর নাম জুয়েল আইচ। তাঁর কল্যাণেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাদু সংস্থা— International Brotherhood of Magicians-এর আমি সদস্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কি ম্যাজিক দেখাই?

উত্তর হলো, না।

আমি ম্যাজিকটা করি সম্পূর্ণই আমার নিজের জন্যে। হঠাৎ হঠাৎ শাওনকে একটা কৌশল দেখাই। সে মুগ্ধ হবার অভিনয় করে। এতেই আমি খুশি।

বলপয়েন্টে ম্যাজিকের অংশটা বিস্তারিত লেখার কারণটা বলি? আমার লেখালেখিতে Magician-এর চরিত্র অনেকবার উঠে এসেছে। পাঠকদের কি মনে আছে 'এইসব দিনরাত্রি'-র আনিসের কথা? যে চিলেকোঠায় থাকতো। ম্যাজিক দেখাতো।

আমি বাস করি ম্যাজিকের জগতে। ছোট্ট নিষাদ যখন হাসে, সেই হাসিতে ম্যাজিক। তার মা যখন গান করে, তাতেও ম্যাজিক। আমি যখন একটি চরিত্র সৃষ্টি করি, সেখানেও ম্যাজিক।

আমার সেই মহান ম্যাজিশিয়ানের স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করে, যিনি আমাদের সবাইকেই অন্তহীন ম্যাজিকে ডুবিয়ে রেখেছেন।

www.MurchOna.com

স্যার, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন ?

না।

তাহলে এত ভূতের গল্প কেন লিখেছেন ?

তোমাদের ভয় দেখানোর জন্যে। মানুষ নিরাপদ জায়গায় বসে ভয় পেতে ভালোবাসে।

স্যার, ভূত কখনো দেখেছেন ?

তুমি দেখেছ ?

জি। ঘটনা বলব ?

বলো।

আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। সামারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। বর্ষাকাল। বৃষ্টি পড়ছে না, তবে আকাশে ঘন মেঘ। যে-কোনো সময় বর্ষণ শুরু হবে। সন্ধ্যার পর পর আমি নৌকায় কাওরাইদ পৌঁছলাম। কিছুটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। গোরস্থানের পাশ দিয়ে রাস্তা। লোক চলাচল নেই বললেই হয়...

শুরু হয়ে গেল ভূতের গল্প। আমি এখন পর্যন্ত এমন কাউকে পাই নি যার ঝুলিতে কোনো ভৌতিক অভিজ্ঞতা নেই। নাস্তিকরা এই বিষয়ে অনেক এগিয়ে। তারা ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাদের ভৌতিক অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। এমন একজন হলেন অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় কঠিন নাস্তিক। তিনি ঈশ্বর, ভগবান, ভূতপ্রেত কিছুই বিশ্বাস করেন না। এক সন্ধ্যায় নুহাশ পল্লীতে একটা ঘটনা ঘটল। তিনি দেখলেন এবং ভীত গলায় বললেন, আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু নুহাশ পল্লীর ভূত বিশ্বাস করি।

ঘটনাটা বলি।

নুহাশ পল্লীতে কী একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। সন্ধ্যা পার হয়েছে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলোকসজ্জা। হাজারখানিক মোমবাতি চারিদিকে জ্বালানো হয়েছে।

www.MurchOna.com

বারবিকিউয়ের প্রস্তুতি চলছে। সুইমিং পুলের চারপাশে সবাই জটলা করছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প চলছে। মেয়েরা পুরুষদের গল্প পছন্দ করলেও এ ধরনের অনুষ্ঠানে তারা আলাদা হয়ে যায়। মেয়েরা মেয়েরা গল্প করে। অনেকের ধারণা তাদের গল্পের বিষয়— শাড়ি, গয়না। তা কিন্তু না। মূল বিষয় কাজের বুয়া সমস্যা।

পার্টি জমে উঠেছে। হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে কেউ বিস্মিত গলায় আঙুল উঁচিয়ে বলল, এটা কী ?

আমরা সবাই তাকালাম। সুইমিং পুলের পেছনে জবা গাছের ঝাড়। ঘন জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। সেই ঘন জংলায় একটি মেয়েমানুষের মূর্তি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মূর্তিটি মনে হচ্ছে আলোর তৈরি। সে দাঁড়ানো থেকে বসছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে।

সবাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। নুহাশ পল্লীর একজন কর্মচারী 'কে ? কে ?' বলে জংলার দিকে ছুটে যেতেই ছায়ামূর্তি সবার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।

পার্টি ভেঙে গেল। সবাই ঘরে চলে এলাম। যে মেয়েটি প্রথম ছায়ামূর্তি দেখেছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মাথায় পানি ঢালা হতে লাগল।

প্রায় চল্লিশজন অতিথির সবাই স্বীকার করলেন, তারা ব্যাখ্যার অতীত একটি ঘটনা দেখলেন। এদের মধ্যে ঔপন্যাসিক মঈনুল আহসান সাবেরও ছিলেন। যদিও তিনি ঢাকায় এসে এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁর ধারণা নুহাশ পল্লীর লোকজন ছাদ থেকে নানান ধরনের আলো ফেলে এই ছায়ামূর্তি তৈরি করেছে।

তাঁর ধারণা সত্যি নয়। নুহাশ পল্লীর বাংলোতে ছাদে ওঠার কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের হাতে এমন কোনো যন্ত্রপাতি নেই যা দিয়ে এমন স্পষ্ট ছায়ামূর্তি (যা উঠবোস করে) তৈরি করা যায়। স্পিলবার্গের কাছে থাকলেও থাকতে পারে।

প্রিয় পাঠক! আমি আপনাকে ভূতে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছি না। শুধু বলতে চাচ্ছি, জগতে কিছু ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা ঘটে। ঘটনা ঘটে বলেই জগতটাকে 'Interesting' মনে হয়।

আমি আমার এক জীবনে (ষাট বছরে) অনেক ব্যাখ্যার অতীত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। একটি বলি।

১৯৭১ সন। এপ্রিল মাস। আমরা পিরোজপুরে আছি। মিলিটারি তখনো পিরোজপুরে আসে নি। ভয়ে-আতঙ্কে সবাই অস্থির। এক ভোরবেলার ঘটনা। সব ভাইবোনরা মা'কে ঘিরে আছি। কারণ তিনি না-কি রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা বলছেন।

www.MurchOna.com

"আমি স্বপ্নে দেখলাম এই বাড়িটাই। তোরা এখন যেমন আমাকে ঘিরে বসে আছিস— স্বপ্নেও সেরকম আমাকে ঘিরে বসা। হঠাৎ সেখানে নয় দশ বছরের একটা মেয়ে ঢুকে বলল, আমার নাম লতিফা। আপনি কি আমাকে চিনেছেন?"

আমার মা স্বপ্নের এই অংশটি বলে শেষ করতেই নয়-দশ বছরের একটি মেয়ে ঢুকল। স্পষ্ট গলায় বলল, "আমার নাম লতিফা। আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমরা বাগেরহাট থেকে মিলিটারির ভয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন আপনাদের সঙ্গে থাকব।..."

এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি সত্যিই আছে?

আমার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগের একটি হচ্ছে, আমি ভূত নামক অর্থহীন বিষয় নিয়ে প্রচুর গল্প লিখি। এবং পাঠককে বাধ্য করি ভূতে বিশ্বাস করাতে। তারা শেষ পর্যন্ত ভূতে বিশ্বাস করে এবং মহাসমস্যায় পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়েই যে ভূত আছে তা কি পাঠকরা জানেন? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ভূত বিশ্বাস করতেন। পরকালে বিশ্বাস করতেন। ভূত বিষয়ে তাঁর অসাধারণ সব গল্প আছে। তাঁর একটি উপন্যাস *দেবযান* পরকাল নিয়ে লেখা। বিভূতিভূষণের মৃত্যুও কিন্তু যথেষ্টই রহস্যময়। তিনি তখন থাকেন ঘাটশিলায়। এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হয়েছেন— হঠাৎ দেখেন একদল শবযাত্রী খাটিয়াতে করে শবদেহ নিয়ে যাচ্ছে। তারা বিভূতিভূষণকে দেখে খাটিয়া নামালো। তিনি খাটিয়ার কাছে গিয়ে দেখেন, শবদেহ আর কারোর না। তাঁর নিজের। তিনি নিজের মৃতদেহ দেখে ছুটে বাড়িতে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে অসুস্থতাতেই তাঁর মৃত্যু।

বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল লেখকের নাম বনফুল (বলাইচাঁদ মুখাপাধ্যায়)। তিনি ভূত-প্রেত মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। প্রচলিত আছে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই একজন ঘোর নাস্তিকও আস্তিক হয়ে ফিরত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আমার প্রিয় লেখকদের একজন (প্রথম কদম ফুল...)। তিনি শুধু যে ভূত বিশ্বাস করতেন তা-না, নিয়মিত ভূত-প্রেতের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন।

'রবীন্দ্রনাথের প্রেতচর্চা' নামের একটা বই পড়ে জেনেছি পরকাল বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা। পরকাল, জন্মান্তর, ভূত-প্রেত বিষয়ে তাঁর চিন্তার সার কথা তিনি লিখেছেন এই কয়েকটি লাইনে—

"চিরকাল এইসব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর।
জন্মান্তের নবপ্রাতে, সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।।"

www.MurchOna.com

কয়েকদিন আগে আমার স্ত্রী শাওনের একটি ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে একটা গল্প লেখা শুরু করেছি, নাম— "কে ?" আমার সব অতিপ্রাকৃত গল্পে 'Personal experience'-এর কিছু ব্যাপার থাকে। অন্যের অভিজ্ঞতা যে ধার করি না তাও না।

বলপয়েন্ট লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে ছোট্ট ভুল অতীতে করেছি। আমার লেখা প্রতিটি অতিপ্রাকৃত গল্পের ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। গল্পটা কেন লিখলাম ? 'শানে নজুল'টা কী। এখন থেকে তাই করব।

যাই হোক, শাওনের ভৌতিক অভিজ্ঞতার গল্পটি করি। জাদুকর জুয়েল আইচ এই অভিজ্ঞতার লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। আমি তাঁর ব্যাখার সঙ্গে একমত নই। কারণ শাওনের ভৌতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমিও কিছুটা যুক্ত।

স্থান নুহাশ পল্লী। রাত দু'টা। ঈদের নাটকের শুটিং (এনায়েত আলীর ছাগল) এইমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা ঘুমুতে এসেছি। আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না। বাতি নেভানো। আলো ছাড়া পুত্র নিষাদ ঘুমুতে পারে না। করিডোরের বাতি জ্বালানো। দরজা অর্ধেক খোলা। খোলা দরজায় যথেষ্টই আলো আসছে। সারাদিনের পরিশ্রমে বিছানায় যাওয়া মাত্রই তিনজনই গভীর ঘুমে। এই সময় শাওন একটা দুঃস্বপ্ন দেখল। দুঃস্বপ্নে কে যেন তার গা ঘেঁসে শুয়ে আছে। আমি তাকে বলছি— এই, তোমার পাশে এটা কী ? শাওন জেগে উঠল। শাওনের স্বভাব হচ্ছে, রাতে যে-কোনো কারণে ঘুম ভাঙলেই আমাকে ডাকবে। আমার কাঁচা ঘুম ভাঙার যন্ত্রণা সে আমলেই নেবে না। সে যথারীতি আমাকে ডেকে তুলল। বলল, ভয় পেয়েছি। পানি খাব। তার হাতের কাছেই পানির বোতল। সেই বোতল আমাকে তুলে দিতে হলো। পানি খেয়ে আবার ঘুমুতে গেল। আবার ঘুম ভাঙল। এবার দুঃস্বপ্ন দেখে না। তার কাছে মনে হলো, কে যেন তার পিঠে হাত রেখেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল— খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে একজন বসে আছে। চাদরে তার গা ঢাকা। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ করিডোরের বাতি নিভানো। শাওন বিকট চিৎকার শুরু করল, এটা কী ? এটা কী ?

তার চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙল। পুত্র নিষাদ জেগে উঠে কান্না শুরু করল। শাওন চিৎকার করেই যাচ্ছে, এটা কী ? এটা কী ?

হাঁটু গেড়ে যে বসে ছিল সে উঠে দাঁড়াল। শান্ত ভঙ্গিতে শোবার ঘর থেকে করিডোরে গেল। ততক্ষণে আমার সংবিত খানিকটা ফিরেছে। শাওন যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছে আমি সেদিকে তাকালাম। আমার চোখে চশমা নেই, আমি স্পষ্ট কিছু দেখছি না। তারপরেও মূর্তিকে দেখলাম। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করিডোরের শেষপ্রান্তের দরজা বন্ধ করল। আমার কাছে মনে হলো নারী মূর্তি।

এর মধ্যে ঘরের বাতি জ্বালানো হয়েছে। আমি দৌড়ে গিয়ে করিডোরের দরজা খুলেছি। কোথাও কেউ নেই।

জুয়েল আইচ বললেন, ভূত-প্রেত কিছু হতেই পারে না। যে ঘরে ঢুকেছে সে মানুষ। কারণ করিডোরের বাতি আগে জ্বালানো ছিল। যে ঘরে ঢুকেছে সে নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে বাতি নিভিয়ে ঢুকেছে।

যুক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। কারণ সে ঘরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে পিঠে হাত রেখে বসে থাকবে কেন? আমাদের সম্মিলিত বিকট চিৎকারেও তার কোনো বিকার হবে না কেন? দৌড়ে পালিয়ে না গিয়ে সে কেন অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে বের হবে?

নুহাশ পল্লীতে আমি যখন রাত্রি যাপন করি, তখন দু'জন সিকিউরিটি গার্ড সারারাত জেগে বাড়ি পাহারা দেয়। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কারো আমার শোবার ঘরে ঢোকার প্রশ্নই আসে না।

ঘটনা যা ঘটেছে তা দিয়েই চমৎকার একটা ভূতের গল্প লেখা যায়। বাড়তি আমি যা যোগ করব বলে ভেবে রেখেছি তা হলো, পরদিন দেখা গেল শাওনের পিঠে মানুষের হাতের ছাপের মতো কালো ছাপ। সেই ছাপে পাঁচটা আঙুলের জায়গায় ছয়টা আঙুল।

ভৌতিক গল্পের উপকরণ আমি সবসময় হাতের কাছেই পাই। গ্রামের বাড়িতে মন্তাজ মিয়া নামের একটি নয়-দশ বছরের বালকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বালকটি মারা গিয়েছিল। তাকে কবর দেয়া হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পর কবর খুঁড়ে তাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তেমন কোনো রদবদল ছাড়াই বালকটির সঙ্গে আমার কথাবার্তা যা হয়েছিল তা নিয়ে একটি গল্প লিখি। পাঠকদের জন্যে গল্পটা দিয়ে দিলাম।

ছায়াসঙ্গী

প্রতিবছর শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব— হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি, তারা খুশি হবে। পুকুরে ঝাপাঝাপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফোটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পড়ে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

www.MurchOna.com

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড় জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু'তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল— কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা— পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনোটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে— 'দেশের অবস্থাডা কী কন দেহি ছোড মিয়া! বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কী ? কী দেশ ছিল আর কী হইল!'

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম, সারাদিন লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দু'জন করে 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে—

ও মনা
এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না— আমি প্রাণে বাঁচতাম না।

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা। একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে রোগামতো দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম, কী রে?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম, চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল, না।

নাম কী রে তোর?

মন্তাজ মিয়া।

আয়, ভেতরে আয়।

না।

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু ডাকা শ্রান্ত দুপরে লেখালেখির আনন্দই অন্যরকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার একই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, কী ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, থাকিস কোথায়?

উত্তরে পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

স্কুলে যাস না?

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের ওপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন, মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

কেন?

বিরাট চোর। যা-ই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুইদিন পরপর মার খায়। তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কী?

www.MurchOna.com

কিছু করে না।

চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়তো তোমার কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।

না, কিছু নেয় নি।

ভালো করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।

কী ঘটনা?

আছে অনেক ঘটনা। বলব একসময়।

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালিখি শুরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি, মন্তাজ মিয়াকে তিনচারজন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফোঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কী ব্যাপার?

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, দেখেন তো কলমটা আপনের কি-না। মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বলপয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চাবয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কী?

ভাইসাব, কলমটা আপনার?

হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চাছেলে, এত মারধর করেছেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হলো, সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলি। আজ একটা কথাও বলা হলো না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচির কাছে। চুরির ঘটনারও দু'দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ, কোন্টা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার

জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলে নি, অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই—

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ 'আমার পুত কই গেল রে!' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়। পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মাঘরের পাশে বাদ আসর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সবকিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হলো দুপুররাতের পর। যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হলো। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কী ? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দিয়ে দেয়ার পর নিকট আত্মীয়স্বজনরা সবসময় বলে— 'ও মরে নাই।' কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈচৈ শুরু করল যে, সবাই বাধ্য হলো মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে— আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে ?

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন, প্রয়োজনে কবর

দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...

কবর খোঁড়া হলো।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দু'টি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন, কী রে মন্তাজ ?

মন্তাজ মৃদুস্বরে বলল, পানির পিয়াস লাগছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এরকম কখনো শুনি নি।

ছোট চাচাকে বললাম, মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি ? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কী কী দেখল না-দেখল এইসব ?

ছোট চাচা বললেন, না। কিছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

জিজ্ঞেস করেন নি কিছু ?

কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল— একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে— লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না ?

প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাতালার কুদরত। আল্লাতালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কী বুঝব কও ?

তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেন নি সে কী করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে ?

জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লার কুদরত। উনার কেরামতি।

ধর্মকর্ম করুক বা না করুক, গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্‌তায়ালার 'কুদরত এবং কেরামতির' ওপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মতো গলায় বলে, 'আল্লার কুদরত।'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না ?

ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

কথা বলতাম।

খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্নেই আসব।

এম্নিতেই আসবে কেন ?

ছোট চাচা বললেন, তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গ্রামের যত মেয়ের বিয়া হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম।

আমি অবাক হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়ে নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছে ?

আসব না মানে ? গেরামের একটা নিয়মশৃঙ্খলা আছে না ?

আমি ছোট চাচাকে বললাম, আমাদের উপলক্ষে যেসব মেয়ে নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না, তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমতো একসময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দু'টা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হলো। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। একরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, কেমন আছ রহিমা ?

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ভালো আছি ভাইজান।

শাড়ি পছন্দ হয়েছে ?

পছন্দ হইব না! কী কন ভাইজান ? অত দামি জিনিস কি আমরা কোনোদিন চউক্ষে দেখছি ?

তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কী করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে ?

www.MurchOna.com

রহিমা অনেকটা চুপ করে থেকে বলল, কী কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।

কী জন্যে মনে হলো ?

জানি না ভাইজান! মনে হইল।

এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে ? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার ?

জি-না।

মন্তাজ তোমাকে কিছু বলে নি ? জ্ঞান ফিরলে সে কী দেখল বা তার কী মনে হলো ?

জি-না।

জিজ্ঞেস কর নি ?

করছি। হারামজাদা কথা কয় না।

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সবসময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কী ভাবল ? কী সে দেখল ? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল ?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয়— জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সবসময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুরবেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়াগাঁর ঝিম ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুট্ করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম, কী খবর মন্তাজ ?

ভালো।

বোন আছে না চলে গেছে ?

গেছে গা।

আয় ভেতরে আয়।

www.MurchOna.com

মন্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা পছন্দ করে। এইসব ছেলেরা ভালোবাসার খুব কাঙাল হয়। অল্পকিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর— এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এইক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের একপ্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?

আইচ্ছা।

ঠিকমতো জবাব দিবি তো?

হ।

আচ্ছা মন্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?

আছে।

যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?

না।

না কেন?

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, কী দেখলি— চারদিকে অন্ধকার?

হ।

কেমন অন্ধকার?

মন্তাজ এবারো জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, কবর তো খুব অন্ধকার। তবু ভয় লাগল না?

মন্তাজ নিচুস্বরে বলল, আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেইজন্যে ভয় লাগে নাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল?

চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।

ছেলে না মেয়ে?

জানি না।

সে কী করল?

আমারে আদর করল। আর কইল, কোনো ভয় নাই।

কীভাবে আদর করল?

মনে নাই।

www.MurchOna.com

কী কী কথা সে বলল ?

মজার মজার কথা— খালি হাসি আসে।

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, কী রকম মজার কথা ? দু'একটা বল তো শুনি ?

মনে নাই।

কিছুই মনে নাই ? সে কে— এটা কি বলেছে ?

জি-না।

ভালো করে ভেবেটেবে বল তো— কোনোকিছু কি মনে পড়ে ?

উনার গায়ে শ্যাওলার মতো গন্ধ ছিল।

আর কিছু ?

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই ?

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।

সেটা কী ?

বলতাম না। কথাডা গোপন।

বলবি না কেন ?

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম— বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

মন্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি, তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।

www.MurchOna.com

আমার জোছনাপ্রীতির বিষয়টা এখন অনেকেই জানেন। কেনইবা জানবেন না! জয়ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়েছি। গান লিখেছি—

ও কারিগর দয়ার সাগর ওগো দয়াময়
চান্নিপসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।

শিল্পী এস আই টুটুল এই গানটির সুরকার। সে নানান অনুষ্ঠানে গানটা করে এবং গলা কাঁপিয়ে আবেগ জর্জরিত ভাষণ দেয়—

আমার স্যার, হুমায়ূন আহমেদ, একদিন ডেকে বললেন, টুটুল, চান্নিপসর রাতে আমার মৃত্যু হবে। তখন তুমি এই গানটি আমার মৃতদেহের পাশে বসে গাইবে।

আমি যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে জানি মৃত মানুষ গানবাজনা শুনতে পারে না। সেখানে আমার শবদেহের পাশে টুটুলকে এই গান কেন করতে বলেছি বুঝতে পারছি না। সেই পরিস্থিতিতে টুটুল যদি গিটার বাজিয়ে গানে টান দেয়, তার ফল শুভ হবে বলেও তো মনে হচ্ছে না। মৃত্যুশোকে কাতর শাওন অবশ্যই টুটুলের গলা চেপে ধরবে।

যাই হোক, জোছনা নিয়ে আমার অনেক বাড়াবাড়ি আছে। একসময় নুহাশপল্লীতে প্রতি পূর্ণিমায় জোছনা উৎসব হতো। এখন কিন্তু হয় না। অপূর্ব জোছনা রাতেও দরজা বন্ধ করে আমি ঝিম ধরে থাকি। শাওন খুবই বিস্মিত হয়। সে বলে, আকাশে এত বড় একটা চাঁদ উঠেছে, চল ছাদে যাই। আমি বলি, না।

না কেন?

ইচ্ছা করছে না।

সাম্প্রতিককালে আমি 'ইচ্ছা করছে না' ব্যাধিতে আক্রান্ত। চমৎকার সব ঘটনা চারপাশে ঘটছে। সেইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে 'ইচ্ছা করে না'।

লেখক মাত্রই জীবনে কয়েক দফা 'ইচ্ছা করে না' ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধি চিকিৎসার অতীত। একটা পর্যায়ে ব্যাধি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তখন লেখকের লিখতে ইচ্ছা করে না। তখন অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নেন।

www.MurchOna.com

উদাহরণ—

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

মায়াকোভস্কি

কাওয়াবাতা

লেখালেখি একধরনের থেরাপি। ব্যক্তিগত হতাশা, দুঃখবোধ থেকে বের হয়ে আসার পথ। আমি এই থেরাপি গ্রহণ করে নিজের মনকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি। গ্রাহাম গ্রীনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> Writing is a form of therapy; sometimes I wonder how all those who do not write, compose or paint can manage to escape the madness, the melancolia, the panic fear which is inherent in a human situation.

জোছনাপ্রীতি আমার এখনো আছে, প্রবলভাবেই আছে। তবে সাময়িকভাবে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছি। বাস করছি আপন অমাবস্যায়। কোনো এক চান্নিপসর রাতে আবারো বের হয়ে আসব। নুহাশ পল্লীতে চন্দ্রউৎসব হবে।

এখন চান্নিপসর আমার মাথায় কী করে ঢুকল সেই গল্প করি। *দৈনিক বাংলা*-য় লেখাটা প্রথম ছাপা হয়েছিল। তারিখ মনে নেই।

চান্নিপসর রাইত

আলাউদ্দিন নামে আমার নানাজানের একজন কামলা ছিল। তাকে ডাকা হতো আলাদ্দি। কামলাশ্রেণীর লোকদের পুরো নামে ডাকার চল ছিল না। পুরো নাম ভদ্রলোকদের জন্যে। এদের আবার নাম কী ? একটা কিছু ডাকলেই হলো। 'আলাদ্দি' যে ডাকা হচ্ছে এই-ই যথেষ্ট।

আলাউদ্দিনের গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। এমন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখা যায় না। মাথাভর্তি ছিল বাবরি চুল। তার চুলের যত্ন ছিল দেখার মতো। জবজবে করে তেল মেখে মাথাটাকে সে চকচকে রাখত। আমাকে সে একবার কানে কানে বলল, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, মানুষের পরিচয় হইল চুলে। যার চুল ঠিক তার সব ঠিক।

কামলাদের মধ্যে আলাউদ্দিন ছিল মহা ফাঁকিবাজ। কোনো কাজে তাকে পাওয়া যেত না। শীতের সময় গ্রামে যাত্রা বা গানের দল আসত, তখন সে অবধারিতভাবে গানের দলের সঙ্গে চলে যেত। মাসখানিক তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যেত না। অথচ শীতের মরশুম হচ্ছে আসল কাজের সময়। এমন

www.MurchOna.com

ফাঁকিবাজকে কেউ জেনে-শুনে কামলা নেবে না। নানাজান নিতেন, কারণ তাঁর উপায় ছিল না। আলাউদ্দিন বৈশাখ মাসের শুরুতে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে চোখে সুরমা দিয়ে উপস্থিত হতো। নানাজানের পা ছুঁয়ে সালাম করে তৃপ্ত গলায় বলত, মামুজী, দাখিল হইলাম।

নানাজান চেঁচিয়ে বলতেন, যা হারামজাদা, ভাগ।

আলাউদ্দিন উদাস গলায় বলত, ভাইগ্যা যামু কই ? আল্লাপাক কি আমার যাওনের জায়গা রাখছে ? রাখে নাই। তার উপরে একটা নয়ন নাই। নয়ন দুইটা ঠিক থাকলে হাঁটা দিতাম। অফমান আর সহ্য হয় না।

এর ওপর কথা চলে না। তাকে আবারো এক বছরের জন্যে রাখা হতো। বারবার সাবধান করে দেয়া হতো যেন গানের দলের সঙ্গে পালিয়ে না যায়। সে আল্লার নামে, পাক কোরানের নামে, নবীজীর নামে কসম কাটত— আর যাবে না।

মামুজী, আর যদি যাই তাইলে আপনের গু খাই।

সবই কথার কথা। গানের দলের সঙ্গে তার গৃহত্যাগ ছিল নিয়তির মতো। ফেরানোর উপায় নেই। নানাজান তা ভালোমতোই জানতেন। বড় সংসারে অকর্মা কিছু লোক থাকেই। এদের উপদ্রব সহ্য করতেই হয়।

আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। আমরা থাকতাম শহরে। বাবা ছুটিছাটায় আমাদের নানার বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমরা অল্প কিছুদিন থাকতাম। এই সময়টা সে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকত। রাতে গল্প শোনাত। সবই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। তার চেয়েও যা মজার তা হলো, তার প্রতিটি গল্পের শুরু চান্নিপসর রাইতে।

'বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, সেইটা ছেল চান্নিপসর রাইত। আহারে কী চান্নি। আসমান যেন ফাইট্যা টুকরা টুকরা হইয়া গেছে। শইলের লোম দেহা যায় এমুন চান্দের তেজ।'

সাধারণত ভূত-প্রেতের গল্পে অমাবস্যার রাত থাকে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে অন্ধকার রাতের দরকার হয়। কিন্তু আলাউদ্দিনের ভূতগুলিও বের হয় চান্নিপসর রাতে। যখন সে বাঘের গল্প বলে, তখন দেখা যায় তার বাঘও চান্নিপসর রাতে পানি খেতে বের হয়।

ছোটবেলায় আমার ধারণা হয়েছিল, এটা তার মুদ্রাদোষ। গল্পে পরিবেশ তৈরির এই একটি কৌশলই সে জানে। দুর্বল গল্পকারের মতো একই টেকনিক সে বারবার ব্যবহার করে।

একটু যখন বয়স হলো তখন বুঝলাম চাঁদনিপসর রাত আলাউদ্দিনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় বলেই এই প্রসঙ্গে সে বারবার ফিরে আসে। সবকিছুই সে বিচার

করতে চায় চান্নিপসর রাতের আলোকে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। নানাজানদের গ্রামের স্কুলের সাহায্যের জন্য একটা গানের আসর হলো। কেন্দুয়া থেকে দু'জন বিখ্যাত বয়াতী আনা হলো। হ্যাজাক লাইট-টাইট জ্বালিয়ে বিরাট ব্যাপার। গান হলো খুব সুন্দর। সবাই মুগ্ধ। শুধু আলাউদ্দিন দুঃখিত গলায় জনে জনে বলে বেড়াতে লাগল, হ্যাজাক বাত্তি দিয়া কি আর গান হয়? এই গান হওয়া উচিত ছিল চান্নিপসর রাইতে। বিরাট বেকুবি হইছে।

সৌন্দর্য আবিষ্কার ও উপলব্ধির জন্যে উন্নত চেতনার প্রয়োজন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে আমাদের আলাউদ্দিন উন্নত চেতনার অধিকারী ছিল? যে সৌন্দর্যের উপাসক সে সবকিছুতেই সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আলাউদ্দিন তো তা পায় নি। তার সৌন্দর্যবোধ চান্নিপসর রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন তো হবার কথা না। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো আলাউদ্দিনের জোছনা-প্রীতির অন্য ব্যাখ্যা দেবেন। তারা বলবেন, এই লোকের অন্ধকার-ভীতি আছে। চাঁদের আলোর জন্যে তার এই আকুলতার পেছনে আছে তার আঁধার-ভীতি, Dark Fobia. যে যাই বলুন, আমাকে জোছনা দেখাতে শিখিয়েছে আলাউদ্দিন। রূপ শুধু দেখলেই হয় না, তীব্র অনুভূতি নিয়ে দেখতে হয়। এই পরম সত্য আমি জানতে পারি মহামূর্খ বলে পরিচিত বোকাসোকা একজন মানুষের কাছে। আমার মনে আছে, সে আমাকে এক জোছনা রাতে নৌকা করে বড় গাঙে নিয়ে গেল। যাবার পথে ফিসফিস করে বলল, চান্নিপসর দেখন লাগে পানির উফরে, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা। পানির উফরে চান্নির খেলাই অন্যরকম।

সেবার নদীর ওপর চাঁদের ছায়া দেখে তেমন অভিভূত হই নি, বরং নৌকা ডুবে যাবে কি-না এই ভয়েই অস্থির হয়েছিলাম। কারণ নৌকা ছিল ফুটো, গলগল করে তলা দিয়ে পানি ঢুকছিল। ভীত গলায় আমি বললাম, পানি ঢুকছে মামা।

আরে থও ফালাইয়া পানি, চান্নি কেমন হেইডা কও।

খুব সুন্দর।

খাইয়া ফেলতে মনে লয় না কও দেহি?

জোছনা খেয়ে ফেলার তেমন কোনো ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু তাকে খুশি করার জন্যে বললাম, হ্যাঁ। আলাউদ্দিন মহাখুশি হয়ে বলল, আও, তাইলে চান্নিপসর খাই। বলেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলো খাওয়ার ভঙ্গি করতে লাগল। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। আমি আমার একটি উপন্যাসে (*অচিনপুর*) এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। উপন্যাসের একটি চরিত্র নবু মামা জোছনা খেত।

আলাউদ্দিন যে একজন বিচিত্র মানুষ ছিল তা তার আশেপাশের কেউ ধরতে পারে নি। সে পরিচিত ছিল অকর্মা বেকুব হিসেবে। তার জোছনা-প্রীতিও

www.MurchOna.com

অন্যকেউ লক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। তার ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হলো যখন সে এক শীতে গানের দলের সঙ্গে চলে গেল, এবং ফিরে এল এক রূপবতী তরুণীকে নিয়ে। তরুণীর নাম দুলারী। তার রূপ চোখ-ঝলসানো রূপ।

নানাজী গম্ভীর গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, বিবাহ করেছি মামুজী। বয়স হইছে। সংসারধর্ম করা লাগে। নবীজী সব্বেরে সংসারধর্ম করতে বলছেন।

সেইটা বুঝলাম। কিন্তু এই মেয়ে কে?

হেইটা মামুজী এক বিরাট ইতিহাস।

ইতিহাসটা শুনি।

ইতিহাস শুনে নানাজান গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, এরে নিয়া বিদায় হ! আমার বাড়িতে জায়গা নাই।

আলাউদ্দিন স্টেশনের কাছে ছাপড়া ঘর তুলে বাস করতে লাগল। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে চলে আসে, কুলিগিরি করে। ছোটখাটো চুরিতেও সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। থানাওয়ালারা প্রায়ই তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার বৌ নানাজানের কাছে ছুটে আসে। নানাজান বিরক্তমুখে তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান। নিজের মনে গজগজ করেন, এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

নানাজানকে যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হলো না। আলাউদ্দিনের বৌ এক শীতে এসেছিল, আরেক শীতের আগেই মারা গেল। আলাউদ্দিন স্ত্রীর লাশ কবরে নামিয়ে নানাজানকে এসে কদমবুসি করে ক্ষীণগলায় বলল, দাখিল হইলাম মামুজী।

বছর পাঁচেক পরের কথা। আমার দেশের বাইরে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে নানার বাড়ি দিয়ে দেখি, আলাউদ্দিনের অবস্থা খুব খারাপ। শরীর ভেঙে পড়েছে। মাথাও সম্ভবত খানিকটা খারাপ হয়েছে। দিনরাত উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকায়। দড়ির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। খুবই উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক কথাবার্তা। তার একটি চোখ আগেই নষ্ট ছিল। দ্বিতীয়টিতেও ছানি পড়েছে। কিছু দেখে বলে মনে হয় না। চোখে না দেখলেও সে চান্নিপসর সম্পর্কে এখনো খুব সজাগ। এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও ভাইগ্না ব্যাটা, আইজ যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে? চান্নি দেখতে যাবা না? যত পার দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

সেই আমার আলাউদ্দিনের সঙ্গে শেষ চাঁদনি দেখতে যাওয়া। সে আমাকে মাইল তিনেক হাঁটিয়ে একটা বিলের কাছে নিয়ে এল। বিলের ওপর চান্নি নাকি

www.MurchOna.com

অপূর্ব জিনিস। আমাদের চান্নি দেখা হলো না। আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘ কাটল না। একসময় টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আলাউদ্দিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, চান্নি আমরার ভাগ্যে নাই। ভাগ্য খুব বড় ব্যাপার ভাইগ্না ব্যাটা। ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

আমরা ভিজতে ভিজতে ফিরছি। আলাউদ্দিন নিচুস্বরে কথা বলে যাচ্ছে, ভাগ্যবান মানুষ এই জীবনে একজন দেখছি। তোমার মামির কথা বলতেছি। নাম ছিল দুলারী। তার মরণ হইলে চান্নিপসর রাইতে। কী চান্নি যে নামল ভাইগ্না! না দেখলে বিশ্বাস করবা না। শইল্যের সব লোম দেহা যায় এমন পসর। চান্নিপসরে মরণ তো সহজে হয় না। বেশির ভাগ মানুষ মরে দিনে। বাকিগুলো মরে অমাবস্যায়। তোমার মামির মতো দুই-একজন ভাগ্যবতী মরে চান্নিপসরে। জানি না আল্লাপাক আমার কপালে কী রাখছে। চান্নিপসরে মরণের বড় ইচ্ছা।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর খবর আমি পাই আমেরিকায়। তার মরণ চাঁদনিপসরে হয়েছিল কি-না তা চিঠিতে লেখা ছিল না, থাকার কথাও নয়। কার কী যায় আসে তার মৃত্যুতে?

রাত দশটার দিকে হঠাৎ করেই গাড়ি নিয়ে বের হলাম। পেছনের সিটে বড় মেয়ে নোভাকে শুইয়ে দিয়েছি। গাড়ি চলছে উল্কার বেগে। নোভা অবাক হয়ে বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মন্টানার দিকে। মন্টানার জঙ্গলে জোছনা দেখব। সে যে কী সুন্দর দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

গাড়ির ক্যাসেট চালু করে দিয়েছি। গান হচ্ছে— 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে'। আমার কেন জানি মনে হলো, আলাউদ্দিন আমার কাছেই আছে। গাড়ির পেছনের সিটে আমার বড়মেয়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে সে আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে।

www.MurchOna.com

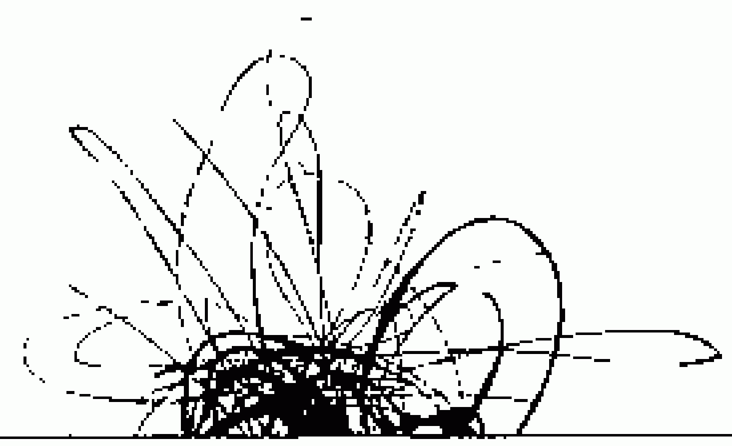

জোছনাপ্রীতির কথা লিখলাম। বর্ষাপ্রীতি বাদ থাকে কেন ?

তখন পড়ি ক্লাস এইটে। চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুল। বাংলা স্যার বললেন, রচনা লিখে আন। প্রিয় ঋতু। চার-পাঁচটা কোটেশন যেন থাকে। প্রতিটা বানান ভুলের জন্যে পাঁচবার কানে ধরে উঠবোস। ডিকশনারি সামনে নিয়ে রচনা লিখবি।

আমরা রচনা লিখে জমা দিলাম। স্যার আমার রচনা পড়ে রাগী গলায় বললেন, কী লিখেছিস ছাগলের মতো! বর্ষা প্রিয় ঋতু ? লিখবি ঋতুরাজ বসন্ত। তাহলে না নাম্বার পাবি। ফুলের সৌরভ, পাখির কূজন। বর্ষায় ফুল ফুটে না। পাখিও ডাকে না।

আমি বললাম, স্যার, বর্ষাই আমার প্রিয়।

তোর প্রিয় তোর মধ্যে থাক। নাম্বার বেশি পেতে হবে না ?

বলপয়েন্টে নাম্বার বেশি পাওয়ার বিষয় নেই, কাজেই বর্ষাই সই।

বর্ষা যাপনের জন্যে আমি নুহাশপল্লীতে বেশ বড় ঘর বানিয়েছি। ঘরের নাম 'বৃষ্টি বিলাস'। ঘরের ছাদ টিনের। সেখানে বৃষ্টি পড়ে অদ্ভুত শব্দে হয়। বৃষ্টির শব্দের কাছে ভৈরবী বা বেহাগ রাগ দাঁড়াতেই পারে না। ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশে পাকিস্তানি যারা সবাই পাকিস্তান চলে গেলেন। ঢাকা বেতারের একজন সেতারবাদক গেলেন না। কারণ হিসেবে বললেন, পাকিস্তানে এরকম করে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টির শব্দ না শুনলে আমি বাঁচব না। সেতারবাদকের নাম আমার মনে ছিল। এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বৃষ্টি নিয়ে আমার মজার কিছু স্মৃতি আছে। যেমন, এক আষাঢ় মাসে আমি রওনা হলাম কক্সবাজার। ঝুম বৃষ্টিতে সমুদ্রের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকব। দেখব কেমন লাগে।

তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। আমি গলাপানিতে বসে আছি। ঢেউ এসে মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে— এমন আনন্দময় অভিজ্ঞতা বহুদিন হয় নি। পাঠকদের কাছে কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, আমি সাগরে নেমেছিলাম সকাল দশটায়। উঠে আসি সন্ধ্যা মেলাবার পর। দুপুরের লাঞ্চ ছিল একটা ডাবের পানি এবং শাঁস।

www.MurchOna.com

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর না। আমার পুত্র নুহাশের বয়স তখন চার মাস। আমি থাকি শহীদুল্লাহ হলে। নামল তুমুল বৃষ্টি। নুহাশের মা বাসায় নেই। ছেলেকে বৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার এই সুযোগ। আমি তাকে নিয়ে ছাদে চলে এলাম। পিতা-পুত্রের ওপর ধারাবর্ষণ হচ্ছে। পুত্র খুবই মজা হচ্ছে। হলের ছাত্ররাও মজা পাচ্ছে।

আমার মজা স্থায়ী হয় নি, কারণ ঠান্ডা লেগে নুহাশের নিউমোনিয়া হয়ে গেল। ডাক্তার-হাসপাতাল ছোটাছুটি। পুত্রের মাতার অশ্রুবর্ষণ।

বর্ষাযাপন নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা লিখেছি। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা যক্ষের ধনের মতো সঞ্চয় করে রাখার অভ্যাস আমার নেই বলে লেখাগুলি হারিয়ে গেছে। এর মধ্যে একটা লেখা ছিল আমেরিকায় বর্ষাযাপনের অভিজ্ঞতা। মন্টানার বনভূমিতে প্রবল বৃষ্টির গল্প।

বাংলার প্রিয় কবি জীবনান্দ দাশের মধ্যে বর্ষা নিয়ে মাতামাতি দেখি না। তিনি হেমন্ত এবং কুয়াশা নিয়েই স্বস্তি বোধ করেছেন। উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বর্ষার পুরো অভিজ্ঞতা তিনি নিয়ে এসেছেন একটি কবিতায়, কবিতার নাম 'বর্ষা যাপন'।

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ থেকে থেকে ডাকে মেঘ
ঝিল্লীরব পৃথিবী ব্যাপিয়া
এমন ঘন ঘোর নিশি দিবসে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া॥

বৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের মতো আপন করে কেউ অনুভব করেছেন বলে আমি মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে আমি ছোট্ট একটা লেখা লিখেছিলাম। লেখাটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল এখন মনে করতে পারছি না। পাঠকদের জন্যে লেখাটি আবারো দিয়ে দিলাম। বিচিত্র কারণে এই লেখাটি বেশ কিছু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। (ইংরেজি অনুবাদ কী একটা সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে।)

বর্ষা যাপন

কয়েক বছর আগের কথা। ঢাকা শহরের এক কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ে খেতে গিয়েছি। চমৎকার ব্যবস্থা। অতিথির সংখ্যা কম। প্রচুর আয়োজন। থালা-বাসনগুলি পরিচ্ছন্ন। যারা পোলাও খাবেন না, তাঁদের জন্যে সরু চালের ভাতের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলাম বেশকিছু বিদেশী মানুষও আছেন। তাঁরা

বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী। দেখাবার মতো কোনো অনুষ্ঠান নেই বলে কন্যা-কর্তা খানিকটা বিব্রত। এটা শুধুমাত্র খাওয়ার অনুষ্ঠান তা বলতে বোধহয় কন্যা-কর্তার খারাপ লাগছে। বিদেশীরা যতবারই জানতে চাচ্ছে, মূল অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে ? ততবারই তাঁদের বলা হচ্ছে, হবে হবে।

কোণার দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে খেতে বসেছি। আমার পাশের চেয়ারে এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার কিছুটা মেজাজ খারাপ হলো। মেজাজ খারাপ হবার প্রধান কারণ— ইনি সঙ্গে করে কাঁটা চামচ নিয়ে এসেছেন। এঁদের এই আদিখ্যেতা সহ্য করা মুশকিল। কাঁটা চামচ নিশ্চয়ই এখানে আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি আগেও লক্ষ করেছি, যারা কাঁটা চামচ দিয়ে খায় তারা হাতে যারা খায় তাদের বর্বর গণ্য করে। যেন সভ্য জাতির একমাত্র লোগো হলো কাঁটা চামচ। পাশের বিদেশী তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম পল অরসন। নিবাস নিউমেক্সিকোর লেক সিটি। কোনো এক এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে এসেছেন অল্পদিন হলো। এখনো ঢাকার বাইরে যান নি। বিমানের টিকিট পাওয়া গেলে সামনের সপ্তাহে কক্সবাজার যাবেন।

কিছু জিজ্ঞেস না করলে অভদ্রতা হয় বলেই বললাম, বাংলাদেশ কেমন লাগছে ?

পল অরসন চোখ বড় বড় করে বলল, Oh, wonderful!

এদের মুখে Oh, wonderful শুনে আহ্লাদিত হবার কিছু নেই। এরা এমন বলেই থাকে। এরা যখন এদেশে আসে, তখন তাদের বলে দেয়া হয়, নরকের মতো একটা জায়গায় যাচ্ছ। প্রচণ্ড গরম। মশা-মাছি। কলেরা-ডায়রিয়া। মানুষগুলিও খারাপ। বেশির ভাগই চোর। যারা চোর না তারা ঘুসখোর। এরা প্রোগ্রাম করা অবস্থায় আসে, সেই প্রোগ্রাম ঠিক রেখেই বিদেয় হয়। মাঝখানে Oh wonderful জাতীয় কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ায়।

আমি পল অরসনের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললাম, তুমি যে ওয়ান্ডারফুল বললে, শুনে খুশি হলাম। বাংলাদেশের কোন জিনিসটা তোমার কাছে ওয়ান্ডারফুল মনে হয়েছে ?

পল বলল, তোমাদের বর্ষা।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এ বলে কী! আমি আগ্রহ নিয়ে পলের দিকে তাকালাম। পল বলল, বৃষ্টি যে এত সুন্দর হতে পারে এদেশে আসার আগে আমি বুঝতে পারি নি। বৃষ্টি মনে হয় তোমাদের দেশের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিকশার হুড ফেলে মতিঝিল থেকে গুলশানে গিয়েছি। আমার রিকশাওয়ালা ভেবেছে, আমি পাগল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমি পলের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগল। অনেক বিদেশীর অনেক সুন্দর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার মতো সুন্দর কথা আমাকে এর আগে কেউ বলে নি। এত চমৎকার একটি কথা বলার জন্যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হলো।

পল অবাক হয়ে বলল, আমি কী অপরাধ করেছি ?

পকেট থেকে কাঁটা চামচ বের করে অপরাধ করেছ।

পল হো-হো করে হেসে ফেলল। বিদেশীরা এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না বলেই আমার ধারণা। পল অরসনের আরো কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হলো। যেমন, খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নাও, সিগারেট নাও।

বিদেশীরা এখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। তারা সিগারেট তৈরি করে গরিব দেশগুলিতে পাঠায়। নিজেরা খায় না। ভাবটা এরকম— অন্যরা মরুক, আমরা বেঁচে থাকব। তারপরেও কেউ কেউ খায়। তবে তারা কখনো অন্যদের সাধে না।

আমি পলের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। পানের ডালা সাজানো ছিল। পল নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে পান মুখে দিয়ে চুন খুঁজতে লাগল। এধরনের সাহেবদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। বর্ষা নিয়েই কথা বলা যেতে পারে। তাছাড়া গরম পড়েছে প্রচণ্ড। এই গরমে বৃষ্টির কথা ভাবতেও ভালো লাগে। আমি বললাম, পল, তোমার বর্ষা কখন ভালো লাগল ?

পল অরসন অবিকল বৃদ্ধা মহিলাদের মতো পানের পিক ফেলে হাসিমুখে বলল, সে একটা ইন্টরেস্টিং ব্যাপার। লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছি দুপুরে। প্লেন থেকে নেমেই দেখি প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড গরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে! এই দেশে থাকব কী করে ? বনানীতে আমার জন্যে বাসা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে এয়ারকুলার আছে বলে আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। আমি ভাবছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছে এয়ারকুলার ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকব। ঘরে কোনো চৌবাচ্চা থাকলে সেখানেও গলা ডুবিয়ে বসে থাকা যায়।

বাসায় পৌঁছে দেখি, এয়ারকুলার নষ্ট। সারাই করার জন্যে ওয়ার্কশপে দেয়া হয়েছে। মেজাজ কী যে খারাপ হলো বলার না। ছটফট করতে লাগলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি, ফ্যানের বাতাসও গরম।

বিকেলে এক মির‍্যাকল ঘটে গেল। দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। আমার বাবুর্চি ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, কালবোশেখী কামিং স্যার।

www.MurchOna.com

ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। মনে হলো, আনন্দজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপ করে গরম কমে গেল। হিমশীতল হাওয়া বইতে লাগল। শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবুর্চি ইয়াছিন ছুটে এসে বলল, স্যার, শিল পড়তাছে, শিল। বলেই ছাদের দিকে ছুটে গেল। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে। ছাদে উঠে দেখি, চারদিকে মহা আনন্দময় পরিবেশ। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে শিল কুড়াচ্ছে। আমি এবং আমার বাবুর্চি আমরা দু'জনে মিলে এক ব্যাগ শিল কুড়িয়ে ফেললাম। আমি ইয়াছিনকে বললাম, এখন আমরা এগুলি দিয়ে কী করব ?

ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, ফেলে দিব।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। প্রথম তুষারপাতের সময় আমরা তুষারের ভেতর ছোটাছুটি করতাম। তুষারের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুড়ে দিতাম। এখানেও তাই হচ্ছে। সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি পলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

এসো কর স্নান নবধারা জলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

পল বলল, তুমি কী বললে ?

রবীন্দ্রনাথের গানের দু'টি লাইন বললাম। তিনি সবাইকে আহ্বান করছেন—বর্ষার প্রথম জলে স্নান করার জন্যে।

বলো কী! তিনি সবাইকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে বলেছেন ?

হ্যাঁ।

তিনি আর কী বলেছেন ?

আরো অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কাব্যের একটি বড় অংশ জুড়েই আছে বর্ষা।

বলো কী!

শুধু তাঁর না, এদেশে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের সবার কাব্যের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বর্ষা।

পল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, বর্ষা নিয়ে এ পর্যন্ত লেখা সবচেয়ে সুন্দর কবিতাটি আমাকে বলো তো, প্লিজ।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

www.MurchOna.com

এই এক লাইন?

হ্যাঁ, এক লাইন।

এর ইংরেজি কী?

এর ইংরেজি হয় না।

ইংরেজি হবে না কেন?

আক্ষরিক অনুবাদ হয়। তবে তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে—

Patter patter rain drops, flood in the river.

পল বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা লাইন।

সাধারণ তো বটেই। তবে অন্যরকম সাধারণ। এই একটি লাইন শুনলেই আমাদের মনে তীব্র আনন্দ এবং তীব্র ব্যথাবোধ হয়। কেন হয় তা আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না।

পল হা করে তাকিয়ে রইল। একসময় বলল, বর্ষা সম্পর্কে এরকম মজার আর কিছু আছে?

আমি হাসিমুখে বললাম, বর্ষার প্রথম মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মাছের মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। তারা পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে।

আশা করি তুমি আমার লেগ পুলিং করছো না।

না, লেগ পুলিং করছি না। আমাদের দেশে এরকম ফুল আছে যা শুধু বর্ষাকালেই ফোটে। অদ্ভুত ফুল। পৃথিবীর আর কোনো ফুলের সঙ্গে এর মিল নেই। দেখতে সোনালি একটা টেনিস বলের মতো। যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন এই ফুল থাকবে। বর্ষা শেষ, ফুলও শেষ।

ফুলের নাম কী?

কদম।

আমি বললাম, এই ফুল সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হলো— বর্ষার প্রথম কদম ফুল যদি কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেয়, তাহলে তাদের সম্পর্ক হয় বিষাদমাখা। কাজেই এই ফুল কেউ কাউকে দেয় না।

এটা কি একটা মিথ?

হ্যাঁ, মিথ বলতে পারো।

www.MurchOna.com

পল তার নোটবই বের করে কদম ফুলের নাম লিখে নিল। আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের চারটি চরণও লিখে দিলাম।

তুমি যদি দেখা না দাও
করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

(If thou showest me not thy face,
If thou leavest me wholly aside,
I know not how I am to pass
These long rainy hours.)

পল অরসনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। তবে ঘোর বর্ষার সময় আমি যখন রাস্তায় থাকি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাই, যদি রিকশার হুড-ফেলা অবস্থায় ভিজতে ভিজতে কোনো সাহেবকে যেতে দেখা যায়।

www.MurchOna.com

কিছুদিন আগে ষাট বছর পূর্ণ করলাম। এটা কোনো সুসংবাদ না, ভয়াবহ দুঃসংবাদ। দিন শেষ হয়ে আসছে। মহাযাত্রার সময় আগত। ট্রেনের চাকার শব্দ কানে আসছে।

কিছু কিছু দুঃসংবাদকে সুসংবাদ ভেবে পালন করার রেয়াজ আমাদের আছে। ৫০তম জন্মদিন, ৬০তম জন্মদিন পালন সেরকম ব্যাপার। শুনলাম জন্মদিন পালনে বিরাট প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সারাদিনব্যাপী হুমায়ূন মেলা, জলসা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এইসব। আমি একটা ব্যাপারে খুশি, উৎসব হাতছাড়া হয়ে যায় নি। হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। ঘটনাটা বলি।

মাসুদ আখন্দ নামে এক যুবক থাকে সুইডেনে। সে নাকি তার জীবনের চরম দুঃসময়ে আমার বই পড়ে বেঁচে থাকার সাহস, প্রেরণা এবং আনন্দ পেয়েছিল। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে সেই বইপড়া ঋণ শোধ করার তাগিদ বোধ করল। সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে এল ঢাকায়। বাকি জীবন নাকি সে গুরুর (হুমায়ূন আহমেদ) সেবা করে কাটিয়ে দেবে। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন একা একা বাথরুমে যাবার মতো শক্তি থাকবে না, তখন সে আমাকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যাবে। বাথরুম থেকে নিয়ে আসবে।

আমার ষাটতম জন্মদিন নিয়ে সে বিরাট লাফ-ঝাঁপ শুরু করল। এর সঙ্গে মিটিং তার সঙ্গে মিটিং। তার পরিকল্পনাও ভয়াবহ। ঐ দিন বাংলাদেশের সমস্ত হিমুদের ঢাকায় ডাকা হবে। তারা সারাদিন একটা স্টেডিয়ামে র‍্যালি করবে। তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন হবে। তাদের জন্যে হবে কনসার্ট। হিমু কনসার্ট। সব শেষে আমি হিমুদের উদ্দেশে ভাষণ দেব।

আল্লাহপাকের আমার ওপর বিশেষ করুণা আছেই বলেই ঘটনা শেষ পর্যন্ত স্টেডিয়ামে গেল না। পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে সীমাবদ্ধ রইল।

আমার মা ভোরবেলায় ষাটটা বেলুন উড়িয়ে পুত্রের শুভ জন্মদিন ঘোষণা করলেন। ছোট্ট একটা ভাষণও তিনি দিলেন। ভাষণের সারমর্ম— তাঁর ছেলেকে ঘিরে যে এত আনন্দ উল্লাস হবে তা তিনি সবই জানতেন। ইত্যাদি।

www.MurchOna.com

সন্ধ্যার পর মূল অনুষ্ঠান। আমি গম্ভীর মুখ করে স্টেজে বসে আছি। ইমদাদুল হক মিলন মাইকে বলে যাচ্ছে—

এখন অমুক এসেছেন, লেখককে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন।

এখন এসেছেন অমুক। তিনি লেখককে...

কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের ব্যাপার ছিল। বইগুলির প্রকাশকরা মোড়ক উন্মোচনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ লোক খুঁজছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের একটি তালিকাও প্রস্তুত হয়েছিল। আমি প্রকাশকদের বললাম, আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকজন হচ্ছে আমার পরিবারের লোকজন। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন তারাই করবে।

আমার কনিষ্ঠপুত্র নিষাদ (বয়স এক বছর নয় মাস) একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে গম্ভীর হয়ে গেল। বইয়ের কভারে তার বাবার ছবি দেখে মহানন্দে বলতে লাগল— এইটা বাবা!

বড় পুত্র নুহাশ একটি বইয়ের মোড়ক খুলল।

স্ত্রী শাওন একটি। আমি একটি। পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ আর কেউ নেই। অথচ একটি বইয়ের মোড়ক তখনো খোলা হয় নি। আমি মিলনকে ডাকলাম। একজন লেখক সবসময়ই আরেকজন লেখকের অতি ঘনিষ্ঠজন। পরিবারের সদস্য না হয়েও সদস্য।

শুরু হলো বক্তৃতামালা। আমি বক্তৃতাগুলি আগ্রহ নিয়ে শুনছি, কারণ আজ যারা বক্তৃতা দিচ্ছেন তারাই আমার মৃত্যুর পরের শোকসভায় বক্তৃতা দেবেন। তারা আজ যা বলছেন, মৃত্যুর পরের সভায় তাই বলবেন। নতুন কিছু না।

বক্তাদের মধ্যে রাশিয়ান ছেলে পাভেলের বক্তৃতা শুনে আনন্দ পেলাম। দর্শকরাও তুমুল হাততালি দিল। পাভেল আমার একটি উপন্যাস (*সবাই গেছে বনে*) রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছে। সে বক্তৃতা দিল বাংলায়।

আমার জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ইমদাদুল হক মিলন ঘোষণা করলেন, হুমায়ূন আহমেদের বড় ছেলে নুহাশ হুমায়ূন তার বাবার সম্পর্কে কিছু বলবে। নুহাশ হুমায়ূন তার বাবার একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছে। বইটির নাম *ফিহা সমীকরণ*।

দর্শকদের মতো আমিও আগ্রহ নিয়ে ছেলের দিকে তাকালাম। সে বলল, অনেকেই এই অনুষ্ঠানে আমার বাবার নাম ভুল উচ্চারণ করেছেন। আমার তা মোটেই ভালো লাগে নি। তাঁর নামের শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া উচিত। তাঁর নাম হুমায়ূন আহমেদ। আহাম্মেদ না। আহম্মদ না।

www.MurchOna.com

পিতার নামের শুদ্ধ উচ্চারণে তার আগ্রহ দেখে মজা লাগল। তারপরেই সে যা বলল তা শুনে দর্শকরা কিছুক্ষণ হতভম্ব সময় কাটালো। তারপরই তুমুল তালি।

সে বলল, আমার বাবা যখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তখন তার পাশে আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি। তিনি যখন চার-পাঁচটা বিয়ে করেন তখনো আমি ছিলাম অনুপস্থিত। আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে ভালো লাগছে।

আমার মাথার ভেতর সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। ছেলে এইসব কী বলছে ? আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। চার-পাঁচটা করি নি। আজকের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বিয়ে টেনে আনাও অশোভন। সে সেখানে চার-পাঁচটা বিয়ে কোথায় পেল ?

অনুষ্ঠান চলছে। গানবাজনা হচ্ছে। আমি ছেলের পাশে চুপচাপ বসে আছি। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি— 'বাবা! চার-পাঁচটা বিয়ের ব্যাপারটা কী ?' তারপরই মনে হলো কী হবে জিজ্ঞেস করে।

এখন আমার ইচ্ছা করছে দ্বিতীয় বিয়ের কিছু খণ্ডচিত্র লিখে ফেলি। অন্য কেউ জানতে চাক না-চাক নিষাদ একসময় জানতে চাইবে।

তখন আমার খুব দুঃসময়। মানসিক বিপর্যয়। শাওনকে তার বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। তার থাকার জায়গা নেই। আমাকে আমার আত্মীয়স্বজনরা পরিত্যাগ করেছে। বন্ধুবান্ধবও পরিত্যাগ করেছে। আমি শাওনকে ডেকে বললাম, আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করছি, কিন্তু তোমার এটা প্রথম বিয়ে। অন্য মেয়েরা যেভাবে বিয়ে করে তুমি সেইভাবেই কর। টাকা দিচ্ছি, যাও একটা বিয়ের শাড়ি কিনে আন।

সে বলল, একা একা বিয়ের শাড়ি কিনে আনব ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথ তোমার জীবনের এই ঘটনার কথা মনে করেই লিখেছেন— 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।'

সে খুবই অল্প টাকায় একটা শাড়ি কিনে আনল। তারপর পার্লারে গেল সাজতে। আমার খুব মায়া লাগল। আজ বেচারির বিয়ে। কেউ তার পাশে নেই ? একজন আত্মীয়! বা একজন বন্ধু!

আমি *অন্যদিন* পত্রিকার সম্পাদক মাজহারের স্ত্রীকে টেলিফোন করে বললাম, স্বর্ণা! একটা মেয়ে বিয়ে করছে। কেউ তার পাশে নেই। একা একা পার্লারে বসে আছে। তোমরা সবাই আমাকে ত্যাগ করেছ আমি জানি। আজকের দিনে মেয়েটার পাশে দাঁড়াও।

www.MurchOna.com

স্বর্ণা বলল, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

শাওন-পুত্র নিষাদ একদিন বড় হবে। সে অবশ্যই ভালোবেসে অতি রূপবতী কোনো তরুণীকে বিয়ে করবে। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সেই বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকব না। তবে আমি চাই খুব ধুমধাম করে সেই বিয়ে হোক। যেন ছেলের বিয়ের আনন্দ দেখে শাওন তার নিজের আয়োজনহীন নিঃসঙ্গ বিয়ের স্মৃতি পুরোপুরি ভুলে যায়।

www.MurchOna.com

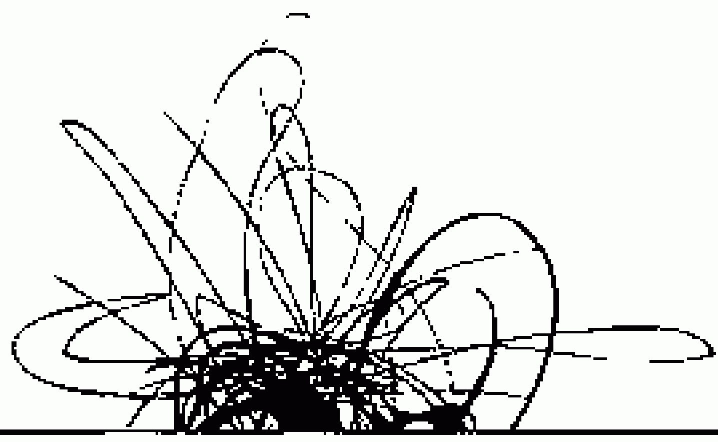

হাতে কোনো বই এলে আমি সবার আগে বইটির পেছনের ফ্ল্যাপে কী লেখা তা পড়ি। সেখানে লেখকের গম্ভীর মুখের একটা ছবি থাকে। তার জন্মবৃত্তান্ত এবং লেখালেখির ইতিহাস থাকে। বেশির ভাগ সময় লেখক নিজেই এই লেখাটা লেখেন বলে তিনি নিজের সম্পর্কে কী ভাবেন তা জানা যায়। একজন লেখক নিজের সম্পর্ক লিখছেন—

> তাঁর লেখায় মানবজীবনের শত বঞ্চনা ভৈরবী রাগিনীর মতো মূর্চ্ছিত হয়েছে। তিনি লাঞ্ছিত নিপীড়িতের মহান আলেখ্যকার। তাঁর দশটি অসাধারণ গল্পের সংকলন *দশ পথিকের পাঁচালি* (প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় মুদ্রণের কাজ চলছে।) ইংরেজি অনুবাদ করছেন শেখ নজরুল ইসলাম এম এ (ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য)। গল্পগ্রন্থের ইংরেজি নাম *Ten Lost Soules Story.*
>
> লেখক পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তার ছোটভাই বাংলাদেশ সরকারের একজন কীর্তিমান নির্ভীক ম্যাজিস্ট্রেট। এক বোন ইতিহাসের প্রভাষক। ভাগ্নিজামাই ছদরুল হোসেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সমাজসেবক।

পাঠক, আবার ভাবছেন না তো আমি এদের নিয়ে তামাশা করছি! তামাশা করার প্রশ্নই আসে না। আমার অনেক বইয়ের ফ্ল্যাপের লেখা আমি নিজে লিখেছি। এখনো লিখছি। নিজেকে পণ্যের আকারে প্রকাশ করার কিছু মজা অবশ্যই আছে।

সবকিছু বদলায়। ফ্ল্যাপের লেখাও বদলায়। শুরুর দিকে মোট কয়টি বই লিখেছি এইসব তথ্য থাকত। কিছু পুরস্কার পাবার পর পুরস্কার তালিকা চলে এল। কিছুদিন পর লেখা হতে লাগল— তিনি টিভিতে ধারাবাহিক নাটক লেখেন। 'এইসব দিনরাত্রি', 'অয়ময়', 'বহুব্রীহি' তার লেখা নাটক। এরপর চলে এল ছবি। তিনি ছবি বানান। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম 'আগুনের পরশমণি'।

www.MurchOna.com

ছবির বিষয়ে কিছুই জানি না। ক্যামেরা জানি না। শট কী বুঝি না। 'ইন' 'আউট' নামক জটিলতা জানি না, তারপরেও কেন ছবি বানাতে গেলাম ? *ছবি বানানোর গল্প* নামের একটি বইয়ে আমি তা ব্যাখ্যা করেছি। বই থেকে এই অংশ পুনর্মুদ্রিত করছি, কারণ বলপয়েন্টে এই লেখা থাকা দরকার—

আমার প্রথম দেখা ছবির নাম 'বহুত দিন হোয়ে'। খুব যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা তা না। আমার শিশুজীবনের খানিকটা গ্লানি ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বড় মামার সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছি। মামা নিতান্তই অনাগ্রহের সঙ্গে আমাকে নিচ্ছেন। তাঁর ধারণা বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁদতে শুরু করব। মাঝখান থেকে তাঁর ছবি দেখা হবে না। আমি যে কাঁদব না তা মামাকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছি। মামা বুঝছেন না।

কাঁদলে কিন্তু আছাড় দিয়ে ভুঁড়ি গালিয়ে ফেলব।

কাঁদব না মামা।

পিসাব পায়খানা যা করার করে নাও। ছবি শুরু হবে আর বলবে পিসাব—তা হবে না।

আচ্ছা।

কোলে বসে থাকবে, নড়াচড়া করবে না। নড়লে চড় খাবে।

নড়ব না।

এতসব প্রতিজ্ঞার পরেও মামা বিমর্ষ মুখে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। সিলেটের 'রঙমহল' সিনেমায় ছবি দেখতে গেলাম। গেটে দু'টা সিংহের মূর্তি। দেখেই গা ছমছম করে। মনে হয় গেটের ওপাশে না জানি কত রহস্য।

মামা টিকিট কিনলেন। সেসময় লাইন-টাইনের কোনো ব্যাপার ছিল না। মনে হয় এখনো নেই। ধস্তাধস্তি করে টিকিট কাটতে হতো। টিকিট হাতে ফিরে আসা আর যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসা কাছাকাছি ছিল। বাচ্চাদের কোনো টিকিট লাগত না। তারা কোলে বসে দেখতো কিংবা চেয়ারের হাতলে বসে দেখতো।

ছবি শুরু হতে দেরি আছে। মামা চা কিনলেন। আমার জন্যে দু'পয়সার বাদাম এবং চানাভাজা কেনা হলো। মামা বললেন, এখন না। ছবি শুরু হলে খাবে। আমি ছবি শুরুর জন্যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। চারদিকে লোকজন, হৈচৈ কোলাহলে নেশার মতো লাগছে। বুক ধক্ ধক্ করছে না জানি কী দেখব। ছবি শুরুর প্রথম ঘণ্টা পড়ল। সেই ঘণ্টাও অন্যরকম। বেজেই যাচ্ছে, থামছে না। লোকজন হলে ঢুকতে শুরু করেছে— মামা ঢুকলেন না। আমাকে নিয়ে বাথরুমে

www.MurchOna.com

ঢুকে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, পিসাব কর। ছবি শুরু হবে, আর বলবে পিসাব— তাহলে কান ছিঁড়ে ফেলব। (প্রিয় পাঠক, মামা অন্যকিছু ছেঁড়ার কথা বলেছিলেন। সুরুচির কারণে তা উল্লেখ করছি না।)

অনেক চেষ্টা করেও পিসাব হলো না। এদিকে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেছে। মামা বিরক্ত মুখে বললেন, চল যাই।

আমাকে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারের হাতলে। হল অন্ধকার হয়ে গেল। ছবি শুরু হলো। বিরাট পর্দায় বড় বড় মুখ। শব্দ হচ্ছে, গান হচ্ছে, তলোয়ারের যুদ্ধ হচ্ছে। কী হচ্ছে আমি কিছুই বুঝছি না। তবে মজাদার কিছু যে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি। বড়মামা একেকবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হলের সব লোকও হাসছে। আমি বললাম, মামা, কী হচ্ছে?

মামা বললেন, চুপ। কথা বললে থাবড়া খাবি।

আমি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, মামা, পিসাব করব।

মামা করুণ ও হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটু পর পর বলতে লাগলাম, মামা, আমি পিসাব করব। মামা, আমি পিসাব করব। সম্ভবত তখন ছবির কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছিল। মামা পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, নিচে নেমে পিসাব করে ফেল। কিছু হবে না।

আমি তৎক্ষণাৎ মাতুল আজ্ঞা পালন করলাম। সামনের সিটের ভদ্রলোক মাথা ঘুরিয়ে মামার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, এই ছেলে তো প্রস্রাব করছে! আমার পা ভিজিয়ে ফেলেছে।

মামা বললেন, ছেলেমানুষ প্রস্রাব তো করবেই। আপনার ঘরে ছেলেপুলে নেই? পা তুলে বসুন না।

সেই সময়ের মানুষদের সহনশীলতা অনেক বেশি ছিল। ভদ্রলোক আর কিছুই বললেন না। পা তুলে মনের আনন্দে ছবি দেখতে লাগলেন।

আমার প্রথম ছবি দেখার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর না হলেও খারাপও ছিল না। অন্ধকার হল, পর্দায় ছবির নড়াচড়া আমার ভালোই লাগল। ইন্টারভ্যালের সময় বাদাম এবং কাঠি লজেন্স খাওয়ার একটা ব্যাপারও আছে। বাসা থেকে রিকশায় করে হলে যাওয়া এবং ফেরার মধ্যেও আনন্দ আছে, রিকশায় চড়ার আনন্দ। কাজেই ছবি দেখার কোনো নড়াচড়া পেলেই আমি এমন কান্নাকাটি, হৈচৈ শুরু করে দেই যে আমাকে না নেয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

সিলেটে আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকতো। শাহজালাল সাহেবের দরগা জিয়ারতের মেহমান। তাঁরা প্রথম দিন শাহজালাল সাহেবের দরগায় যেতেন

www.MurchOna.com

(আমি সঙ্গে আছি, দরগার গেটে হালুয়া কেনা হবে। যার স্বাদ ও গন্ধ বেহেশতি হালুয়ার কাছাকাছি)। শাহজালাল সাহেবের মাজার জিয়ারতের পর আসে শাহ পরাণ সাহেবের মাজার জিয়ারতের প্রশ্ন। অধিকাংশ মেহমান সেই মাজার এড়িয়ে যান। গরম মাজার, ভুল ত্রুটি হলে মুশকিল। মাজারপর্ব শেষ হবার পর মেহমানদের ছবি দেখার আগ্রহ জেগে ওঠে। সিলেটে শহরে তখন দুটি ছবিঘর। দুই ছবিঘরে দু'রাত ছবি দেখা হয়। আমি তখনো সঙ্গে আছি।

সবচেয়ে মজা হতো মা'র সঙ্গে ছবি দেখতে গেলে। পুরনো শাড়ি দিয়ে রিকশা পেঁচানো হতো। বোরকা পরা মায়েরা রিকশার ঘেরাটোপে ঢুকে যেতেন। আমরা বাচ্চারা পর্দার বাইরে। এক-একজন মহিলার সঙ্গে চার-পাঁচটা করে শিশু। দুটি সন্তানই যথেষ্ট এই থিয়োরি তখনো চালু হয় নি। সেসময় দু'টি সন্তান যথেষ্ট নয় বলে বিবেচনা করা হতো।

সিনেমা হলে মহিলাদের বসার জায়গা আলাদা। কালো পর্দা দিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে আলাদা করা। ছবি শুরু হবার পর পর্দা সরানো হবে। তার আগে নয়। মহিলাদের অংশে খাণ্ডারনী টাইপের একজন আয়া থাকে। তার কাজ হলো, ছবি শুরু হবার পর সামনের কোনো পুরুষমানুষ পেছনদিকে তাকাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা। কেউ তাকালেই বিকট চিৎকার— ঐ কী দেখস? চউখ গালাইয়া দিমু। ঘরে মা ভইন নাই?

পর্দায় উত্তম-সুচিত্রার রোমান্টিক সংলাপ হচ্ছে আর এদিকে চলছে শিশুদের চেঁ ভ্যাঁ। মায়েদের তাতে ছবি উপভোগ করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এই শিশুকে সামলাচ্ছেন, এই সুচিত্রার কষ্টে চোখের পানি ফেলছেন। সাধে কি আর বলে, মেয়েরা সর্বংসহা।

সেবছরই শীতের শুরুতে হঠাৎ বাসায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দেয়ালের ছবি সব নামিয়ে ফেলা হতে লাগল। বাসায় যে ফরসি হুঁকা আছে তা ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হতে লাগল। দেশ থেকে দাদাজান আসবেন। আমি খুব উল্লসিত বোধ করলাম না। কারণ দাদাজান নিতান্তই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ইবাদত বন্দেগি নিয়ে থাকেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন বলেই বোধহয় আমাদের সবসময় পড়া ধরেন। সন্ধ্যাবেলা নামাজ শেষ করেই বলবেন, কই বই নিয়ে সবাই আস দেখি। পড়া না পারলে তাঁর মুখ স্কুলের স্যারদের মতোই গম্ভীর হয়ে যায়। এরকম মানুষকে ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। গল্প যে তিনি একেবারেই বলতেন না তা না, বলতেন, তবে বেশির ভাগই শিক্ষামূলক গল্প। 'ঈশপ' টাইপ। সব গল্পের শেষে কিছু উপদেশ।

www.MurchOna.com

এক রাতের কথা, দাদাজানের সম্ভবত মাথাব্যথা। আমাদের পড়তে বসতে হলো না। বাতি নিভিয়ে তিনি শুয়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন, দেখি একটা গল্প বল তো।

আমি তৎক্ষণাৎ গল্প শুরু করলাম। সদ্য দেখা সিনেমার গল্প। কোনো কিছুই বাদ দিলাম না। সুচিত্রা-উত্তমের প্রেমের বিশদ বর্ণনা দিলাম। দাদা শুয়ে ছিলেন, এই অংশে উঠে বসলেন। তাঁর মুখ হা হয়ে গেল। আমার ধারণা হলো, তিনি গল্প খুব পছন্দ করছেন। গল্প শেষ করে উৎসাহের সঙ্গে বললাম, আরেকটা বলব দাদাজান?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, না, তোর মাকে ডাক।

মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। দাদাজান একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় অনেক কঠিন কঠিন তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হলো। বক্তৃতার সামারি এন্ড সাবসটেন্স হচ্ছে— বাবা-মা'র প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্তান সৎভাবে পালন। সেই কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা হচ্ছে। ছেলে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। গান-বাজনা, নাটক-নভেল, সিনেমা সবই আত্মার জন্যে ক্ষতিকর। এই ছেলের ভয়ঙ্কর ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আর যেন না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। বউমা, তোমাদের সবার জন্যে সিনেমা নিষিদ্ধ। কারণ তোমাদের দেখেই তোমাদের ছেলেমেয়েরা শিখবে। যাই হোক, আমি খাস দিলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করছি যেন সিনেমা নামক ব্যাধির হাত থেকে তোমরা দূরে থাকতে পার।

দাদাজানের প্রার্থনার কারণেই কিনা কে জানে তিনি সিলেট থাকতে থাকতেই বাবা বদলি হয়ে গেলেন দিনাজপুরের জগদ্দল নামের এক জঙ্গলে। সিনেমা-টিনেমা সব ধুয়ে মুছে গেল। তবে তাতে আমার তেমন ক্ষতি হলো না। জগদ্দলের অপূর্ব বনভূমি আমার শিশুচিত্ত দখল করে নিল।

দাদাজানের প্রার্থনার জোর আট বছরের মাথায় কমে গেল বলে আমার ধারণা। কারণ আট বছরের মাথায় আবার সিনেমা ব্যাধি আমাকে গ্রাস করল। তখন মেট্রিক পাশ করে ঢাকায় পড়তে এসেছি। হোস্টেলে থাকি। বাবা-মা থাকেন বগুড়ায়। পূর্ণ স্বাধীনতা। বড় হয়ে গেছি এরকম একটা ভাবও মনে আছে। আচার-আচরণে বড় হওয়াটা দেখাতে হবে। কাজেই দল বেঁধে সিনেমা দেখা। হাতের কাছে বলাকা সিনেমাহল। একটু এগুলেই গুলিস্তান। একই বিল্ডিং-এ নাজ— ভদ্রলোকের ছবিঘর। হোস্টেল সুপারের চোখ এড়িয়ে সেকেন্ড শো ছবি দেখার আনন্দও অন্যরকম। সেই সময় প্রচুর আজেবাজে ছবি দেখেছি। লাস্যময়ী নীলুর 'খাইবার পাস', সাপখোপের ছবি 'নাচে নাগিন বাজে বীণ', 'আগ কা দরিয়া', 'ইনসানিয়াৎ' (পাকিস্তানি ছবি। বম্বের ছবি না। তখন ভারতের ছবি

www.MurchOna.com

আসত না। দেশীয় ছবি প্রটেকশন দেবার জন্যে ভারতের ছবি আনা বন্ধ ছিল)। বলাকা সিনেমাহলে নতুন ছবি রিলিজ হয়েছে আর আমি দেখি নি এমন কখনো হয় নি। এমনও হয়েছে একই দিনে দু'টা ছবি দেখেছি, দুপুর দেড়টায় ইংরেজি ছবি, তিনটায় ম্যাটিনিতে উর্দু ছবি। আমাদের সময় ছবি দেখতে টাকা লাগত কম। আইয়ুব খান সাহেব ব্যবস্থা করেছিলেন— ছাত্র সিনেমা দেখবে হাফ টিকিটে। আইডি কার্ড দেখালেই অর্ধেক দামে স্টুডেন্ট টিকিট। ছাত্রদের সিনেমা দেখানোর জন্য আইয়ুব খান সাহেব এত ব্যস্ত ছিলেন কেন কে জানে। ক্রমাগত ছবি দেখে বেড়ালেও মনের গভীরে সবসময় মনে হতো— আমি যা করছি তা ঠিক না। ভুল করছি। নিজের ভেতর চাপা অপরাধবোধ কাজ করত। অবচেতন মনে হয়তো দাদাজানের বক্তৃতা খেলা করত। এই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল।

সুলতানা ম্যাডাম তখন আমাদের বাংলা পড়াতেন। ম্যাডাম সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন। ঝলমলে তরুণী। তখনো বিয়ে করেন নি। ছেলেদের কলেজে পড়াতে এসেছেন বলে খানিকটা বিব্রত। তবে চমৎকার পড়ান। আমরা ক্লাসে কোনো ফাজলামি করলে আহত চোখে তাকিয়ে থাকেন। চোখের দৃষ্টিতে বলতে চেষ্টা করেন, আমি তোমাদের এত পছন্দ করি, আর তোমরা এমন দুষ্টামি কর ? আমাদের বড় মায়া লাগে। একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, আজ আমার মনটা খুব খারাপ। গতকাল একটা সিনেমা দেখে খুব কেঁদেছি। মন থেকে ছবির গল্পটা কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। সম্ভব হলে তোমরা ছবিটা দেখো। ছবির নাম— 'রোমান হলিডে'।

সেই রাতেই আমরা দল বেঁধে 'রোমান হলিডে' দেখতে গেলাম। আমার জীবনে প্রথম দেখা ভালো ছবি। সামান্য একটা ছবি যে মানুষের হৃদয়-মন দ্রবীভূত করতে পারে, বুকের ভেতর হাহাকার তৈরি করতে পারে আমার ধারণার ভেতর তা ছিল না। সত্যিকার অর্থে সেদিনই ছবির প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হলাম। আরম্ভ হলো বেছে বেছে ছবি দেখার পর্ব। একটা ভালো বই যেমন কয়েকবার পড়া হয়, একটা ভালো ছবিও অনেকবার করে দেখতে শুরু করলাম। সবচেয়ে বেশি কোন ছবিটি দেখেছি ? সম্ভবত 'দি ক্রেইন আর ফ্লাইয়িং'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী। মেয়েটির প্রেমিকা যুদ্ধে গিয়েছে। মেয়েটি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ট্রেনে করে ফিরছে সৈনিকরা, মেয়েটি ফুল হাতে এসেছে স্টেশনে। কতজন ফিরেছে, শুধু ফেরে নি সেই ছেলেটি। একসময় মেয়েটি হাতের ফুল, যারা ফিরেছে তাঁদের হাতেই একটা একটা করে দিতে শুরু করল। তার চোখভর্তি জল। হঠাৎ সে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক বক পাখি। শীত শেষ হয়েছে বলে তারা ফিরে আসছে নিজবাসভূমে। আহা কী দৃশ্য!

www.MurchOna.com

আজ আমি মনে করতে পারছি না অসাধারণ সব ছবি দেখতে দেখতে কখনো মনের কোণে উঁকি মেরেছে কি-না— আহা, এরকম একটা ছবি যদি বানাতে পারতাম! অপূর্ব সব উপন্যাস পড়ার সময় এ ধরনের অনুভূতি আমার সবসময় হয়। *পথের পাঁচালী* যতবার পড়ি ততবারই মনে হয়, আহা, এরকম একটা উপন্যাস যদি লিখতে পারতাম! ছবির ক্ষেত্রে এরকম না হবারই কথা। ছবি অনেক দূরের জগৎ, অসম্ভবের জগৎ, তারপরেও হতে পারে। মানুষের অবচেতন মন অসম্ভবের জগৎ নিয়ে কাজ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষের দিকে এসে অসম্ভবের জগতের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তার নাম আনিস সাবেত। পদার্থবিদ্যার তুখোড় ছাত্র, কিন্তু তার ভালোবাসা বস্তুজগতের জন্যে নয়। তার ভালোবাসা অন্য এক জগতের জন্যে। সেই জগৎ ধরাছোঁয়ার বাইরের জগৎ, আলো ও আঁধারের রহস্যময় জগৎ।

এক জোছনা রাতে রাস্তায় হাঁটছি। তিনি হঠাৎ বললেন, ফিল্মে জোছনা কীভাবে তৈরি করা হয় জানো?

আমি মাথা নাড়লাম— জানি না। জানার কোনো প্রয়োজনও কখনো মনে করি নি। তিনি দেখি দীর্ঘ এক বক্তৃতা শুরু করলেন। জোছনার বক্তৃতা শেষ হবার পর শুরু হলো জোনাকি পোকার বক্তৃতা। সত্যজিৎ রায় কীভাবে জোনাকি পোকার আলো পর্দায় নিয়ে এসেছেন সেই গল্প। চার-পাঁচটা টর্চ লাইট নিয়ে কয়েকজন বসেছে। টর্চ লাইটগুলির মুখে কাপড় বাঁধা। তারা টর্চ জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে।

আমি বললাম, ফিজিক্স ছেড়ে এখন কি এইসব পড়ছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ঠিক করেছি ছবি বানানোকেই আমি পেশা হিসেবে নেব।

এই বিষয়ে তো আপনি কিছুই জানেন না।

কুবরিকও কিছু জানতেন না।

কুবরিক কে?

স্ট্যানলি কুবরিক একজন ফিল্ম মেকার, সত্যজিৎ রায় যার একটা ছবি কুড়িবার দেখেছিলেন।

আপনি তাঁর কোনো ছবি দেখেছেন?

একটাই দেখেছি— 'স্পেস অডিসি ২০০১'। অসাধারণ ছবি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনি তাহলে স্ট্যানালি কুবরিক হতে যাচ্ছেন?

আনিস ভাই বিরক্ত মুখে বললেন, আমাকে নিয়ে রসিকতা করবে না। আমি যা বলছি তা করব। অসাধারণ সব ছবি বানাব। এই দেশের মানুষ মুগ্ধ হয়ে আমার ছবি দেখবে।

www.MurchOna.com

ছবি বানাতে প্রচুর টাকা লাগে। আপনি টাকা পাবেন কোথায় ?

যেখান থেকেই পাই, তোমার কাছে ধার করার জন্যে যাব না।

আপনি রাগ করছেন কেন ?

আমি তোমাকে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলছি, তুমি হেলাফেলা করে শুনছ, সেইজন্যেই রাগ করছি। মানুষের স্বপ্ন নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই।

আর করব না, সরি।

আমার স্বপ্ন কি তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে ?

আমি বললাম, না, মোটেই হাস্যকর মনে হচ্ছে না।

আনিস ভাইকে না বললেও আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছিল।

আনিস ভাই তাঁর ব্যক্তিগত স্বপ্নের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করতে চাইলেন। ছবি প্রসঙ্গে যে-কোনো বই পান নিয়ে আসেন। নিজে পড়েন। আমাকে পড়তে দেন। আমি না পড়েই বলি, পড়েছি। অসাধারণ বই।

ছবি দেখতে ভালো লাগে, ছবির শুকনো থিয়োরি পড়তে ভালো লাগবে কেন ? আমার লাভের মধ্যে লাভ এই হলো আমি অনেকগুলি নাম শিখলাম। 'আইজেনস্টাইন', 'বেটেলশিপ পটেমকিন', 'অক্টোবর', 'গদার', 'ফেলিনি', 'বাইসাইকেল থিফ'... আমার এই অল্প বিদ্যা পরবর্তী সময়ে খুব কাজে এসেছে। অনেক আঁতেলকে ভড়কে দিতে পেরেছি। আঁতেলদের দৌড়ও ঐ নাম পর্যন্ত বলেই ব্যাপার ধরতে পারেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর আনিস ভাইয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ চলে এলাম। কাজকর্ম নেই বললেই হয়। সপ্তাহে দু'টা মাত্র ক্লাস। দুপুরের পর কিছু করার নেই। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে খানিকক্ষণ হাঁটি, রাতে গল্প লেখার চেষ্টা করি। থাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউস বেশির ভাগ সময় থাকে খালি। গেস্ট বলতে আমি একা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিচিত্র সব ভৌতিক শব্দ হতে থাকে। ভয়ে জেগে বসে থাকি। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। এই সময় আনিস ভাই মোটা এক খাতা হাতে ময়মনসিংহে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছেন। মোটা খাতায় সেই চিত্রনাট্য। জনাব আহমেদ ছফার লেখা *ওংকার* উপন্যাসের চিত্রনাট্য। আমাকে শোনাবেন। আমি বললাম, কতদিন থাকবেন ?

চিত্রনাট্য পড়তে যতদিন লাগে ততদিন থাকব।

www.MurchOna.com

চিত্রনাট্য পড়তে তাঁর দীর্ঘদিন লাগল। একসঙ্গে তাঁকে বেশি পড়তে দেই না। দু'এক পাতা পড়া হতেই বলি, বন্ধ করুন। চট করে শেষ করলে হবে না। ধীরে-সুস্থে এগুতে হবে। আবার গোড়া থেকে পড়ুন।

আমার ভয়, পড়া শেষ হলেই তিনি চলে যাবেন, আমি আবার একলা হয়ে যাব। একসময় চিত্রনাট্য পড়া শেষ হলো। আমাকে স্বীকার করতে হলো, অসাধারণ কাজ হয়েছে। আনিস ভাই ঢাকায় যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

রাতের ট্রেনে ঢাকা যাবেন। আমি স্টেশনে তাঁকে উঠিয়ে দিতে যাব। ট্রেন রাত দশটায়, আনিস ভাই সন্ধ্যা থেকেই মনমরা। কী একটা বলতে গিয়েও বলছেন না। শুধু বললেন, খুব একটা জরুরি কথা আছে, এখন বলব না। ট্রেন ছাড়ার আগে আগে বলব।

জরুরি কথা কী হতে পারে আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তা বোধ করছি। আনিস ভাই ট্রেন ছাড়ার আগে আগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, হুমায়ূন, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কানাডায় যাচ্ছি ইমিগ্রেশন নিয়ে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন যাচ্ছেন ?

আনিস ভাই সেই কেন'র জবাব দিলেন না। আমি বললাম, কবে যাচ্ছেন ?

পরশু যাব। দেশের শেষ ক'টা দিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম।

আমরা ছবি বানাব না ?

আনিস ভাই জবাব দিতে পারলেন না, ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি খুব অভিমানী। তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখলাম না। যে দেশ নিয়ে তাঁর এত স্বপ্ন সেই দেশ ছেড়ে কী করে তিনি চলে যান ? পিএইচডি করতে আমেরিকা গিয়েছি। হাতের কাছে কানাডা, ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছে যেতে পারি। গেলাম না। আমার অভিমান ভালোবাসার মতোই তীব্র।

তাঁর সঙ্গে দেখা হলো দশ বছর পর। এক দুপুরে হঠাৎ আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় এসে উপস্থিত। সমস্ত রাগ, অভিমান ভুলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কত গল্প। গল্প ফুরাতেই চায় না। একসময় ছবি বানানোর প্রসঙ্গ এসে পড়ল। তিনি জানালেন, একটা শর্ট ফিল্ম বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন। ছবিটি জার্মান ফিল্ম ফ্যাস্টিভেলে 'অনারেবল মেনসান' পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানের চিত্ররূপ দিয়েও একটা ছবি বানিয়েছেন ১৬ মিলিমিটারে। ছবি বানানোর টাকা এখন তাঁর হয়েছে। দেশে এসে ছবি বানাবেন। অসুস্থ মাকে দেখতে এক সপ্তাহের জন্যে দেশে এসেছিলেন, এক সপ্তাহ কাটিয়ে কানাডা ফিরে গেলেন।

www.AmarBoi.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আবার যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল। চিঠি লিখি, উত্তর আসে না। একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলেন, টেলিফোন করলে নো রিপ্লাই আসে।

বছরখানিক পরের কথা। এক গভীর রাতে টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠে রিসিভার হাতে নিতেই আনিস ভাইয়ের গলা শুনলাম। রাত তিনটায় ঘুম ভাঙানোর জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর হঠাৎ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন, আমার ক্যানসার হয়েছে, থ্রোট ক্যানসার। আমি মারা যাচ্ছি। এখন টেলিফোন করছি হাসপাতাল থেকে। মাঝে মাঝে তোমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করব, তুমি কিছু মনে করো না। মৃত্যুর আগে প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছে করে।

তিনি হাসপাতালের বেড থেকে টেলিফোন করতেন। তিনিই কথা বলতেন। আমি শুনতাম। তাঁর গলার স্বর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ কথা বোঝা যেত না। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হতো। তারপরেও অনবরত কথা বলতেন, পুরনো সব স্মৃতির গল্প। তাঁর স্বপ্নের গল্প। সব গল্পই একসময় ছবি বানানোতে এসে থামত। আহা, কী অবসেশানই না তাঁর ছিল ছবি নিয়ে।

মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাদের স্বপ্ন মরে না। আনিস ভাই মারা গেলেন, তাঁর স্বপ্ন কিন্তু বেঁচে রইল। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে সেই স্বপ্ন ঢুকে গেল আমার মধ্যে। এক ভোরবেলায় আমার মেজো মেয়ে শীলাকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, মা। আমি একটা ছবি বানাব। ছবির নাম 'আগুনের পরশমণি'। তুমি সেখানে অপলা চরিত্রে অভিনয় করবে।

—

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

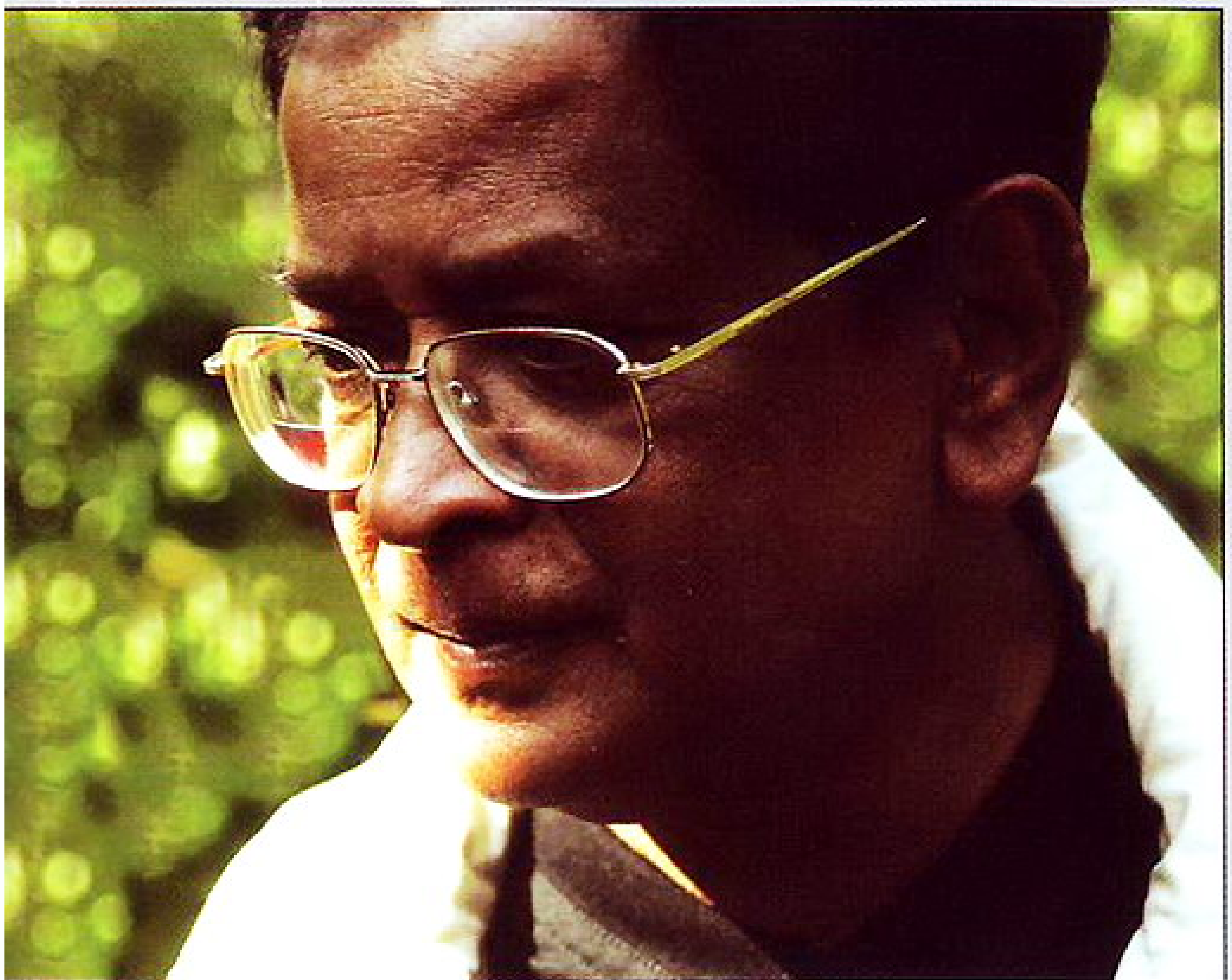

আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো !

Ballpoint by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com